চাবিবন্ধ সিন্দুক

আশাপূর্ণা দেবী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ✲ কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৬৮

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন. রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মানসী প্রেস, ৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

কল্যাণীয় শ্রীমান অভিজিৎ
কল্যাণীয়া শ্রীমতী শুকতারা

চিরস্নেহাস্পদেষু—

আশাপূর্ণা দেবীর অন্যান্য বই

প্রথম প্রতিশ্রুতি
সুবর্ণলতা
বকুলকথা
বালির নীচে ঢেউ
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে
বিজয়ী বসন্ত
অগ্নিপরীক্ষা
যোগ বিয়োগ
গল্প সমগ্র
শশীবাবুর সংসার
চিত্রকল্প
নিজস্ব রমণী
নাটকের শেষ দৃশ্যে
সন্ধিক্ষণ
সূর্যাস্তের রঙ
পাখির খাঁচা খাঁচার পাখি
চার দেওয়ালের বাইরে
যে যার দর্পণে
কখনো দিন কখনো রাত
যার বদলে যা
লীলা চিরন্তন

প্রভৃতি

চাবিবন্ধ সিন্দুক

ধুলোর কার্পেটে ঢাকা মাকড়সার জালের মশারির মধ্যে শুয়ে থাকা বৃহৎ বিশাল কাঠের সিন্দুকটা দেখে ছাপান্ন আর আটান্নর দুই ভাই যেন বিস্মৃত স্মৃতির এক ঝাপটে ছয় আর আটে এসে আছড়ে পড়লেন।

হ্যাঁ, ছয় আর আট! সেই বয়সের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই সিন্দুকটা! আপাতত ধুলোর আস্তরণ ভেদ করে তার ডালার ওপরকার চৌখুপি কাটা কারুকার্যটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু সেই ছেলে দুটো তো সেটা দেখতে পাচ্ছে। আর দেখতে পেয়ে মনে সংসারী দুটো প্রৌঢ় লোকের কি 'নস্টালজিয়া' এসে গেল?

দাদা!

নীলু!

সেই সিন্দুকটা!!

তাই তো মনে হচ্ছে।

মনে হওয়ার আর কী আছে দাদা—সেটাই। এইটাই তো দাদুর ঘর ছিল। হ্যাঁ, ওই তো জানালা দিয়ে ধর্মেশ্বরতলার শিবমন্দিরের মাথার ত্রিশূলটা দেখা যাচ্ছে।

ধর্মেশ্বরতলা! কী আশ্চর্য! নামটা তোর মনে ছিল?

ছিল না। হঠাৎ এইমাত্র, মানে দেখামাত্রই মনে পড়ল। ওই দেয়াল-ধারে দাদুর একটা খাট ছিল—

কই সেটা তো দেখছি না!

যেখানে যা ছিল সবই কী তুই এসে দেখতে পাচ্ছিস দাদা?

বলে ফেলেই চমকে উঠল নীলকমল বা নীলু। দাদাকে 'তুই' করে কথা বলল সে? কতকাল পরে?

লালকমলও কী একটু চমকালো? কানের পর্দায় কী একটু ধাক্কা দিল? দিল বোধহয়। কিন্তু সেটা কী রূঢ়? কোনোকালে কখনো শোনা একটা সুরও তো হঠাৎ কানের পর্দায় ধাক্কা দিতে পারে! তবে তার জন্যে বাইরে কিছু তারতম্য ঘটল না। ভাইয়ের কথায় উত্তরটা দিল তৎক্ষণাৎ।

তা দেখছি না বটে। বিশ্বস্ত পাড়া-পড়শীরা, মা যাঁদের কাছে

অনুরোধ জানিয়ে গেছলেন, যতদিন না মা আবার ফিরে আসেন, ততদিন সর্বকিছুর ওপর একটু চোখ রাখতে, তাঁরাই বোধহয় সর্বকিছুতেই চক্ষুদান করেছেন। এই সিন্দুকটাই নেহাৎ নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি বলে বোধহয়—যা ভারি!

নীলু হাসল, চক্ষুদানের ব্যাপারে 'ভারী হালকা' কোনো প্রশ্ন থাকে না দাদা! 'সম্ভব হয়নি' বোধহয় চক্ষুলজ্জায়। বাসনপত্র বাক্স বিছানা আলনা-আরশি খাট-চৌকি সর্বকিছুই সব বাড়িতে থাকতে পারে। 'আমার জিনিস' বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এ হেন জিনিসটাকে 'আমার বলে চালানো শক্ত। কেয়ারটেকার পড়শীর ওপর আবার চৌকিদার পড়শীও তো থাকে।

লালকমল ঘোষাল, যে লোকটা নাকি গতমাসে রিটায়ার করেছে এবং ফেয়ারওয়েলে গরদের চাদর, রুপো বাঁধানো ছড়ি, আর একখানা সোনার জলে নাম লেখা কোনো এক প্রকাশনার রাজসংস্করণ সটীকা গীতা উপহার পেয়েছেন, সেই লোক স্রেফ ছেলেমানুষের মতো বলে উঠল, সিন্দুকটায় আমাদের কী ভয়টাই ছিল, তোর মনে পড়ছে নীলু?

খুব পড়ছে। এখানে এসে দেখছি সবই মনে পড়ছে। অথচ মনের কোণায় কোথাও কোনোখানে একটু ছায়াও ছিল না। দাদু বলতো, 'ওটার মধ্যে একটা 'ডাইনি বুড়ি' আছে। ছোটো ছেলেরা ওর দিকে গেলে, কী হাত ঠেকালেই খুট করে ডালা খুলে মাথা বার করে তাকে মুঠোয় চেপে ওর মধ্যে পুরে ফেলবে, আর পরে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে।' এ ঘরে ঢুকলেই ওটার দিকে চোখ পড়তো আর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতো।

তোরও তাই হতো? আমারও ঠিক তাই।

আচ্ছা দাদা! আমাদের ঠাকুর্দা বুড়োটা অমন নিষ্ঠুর ছিল কেন বল তো? বাপ মরা দুটো ছোট্ট ছোট্টনাতি, তাদের সঙ্গে অমন খারাপ ব্যবহার করতো কী করে?

সেকালের বুড়োরা বোধহয় ওইরকম মায়া মমতাহীন হতো রে নীলু। মনে আছে, আমাদের মায়ের সঙ্গেও কীরকম দুর্ব্যবহার করতেন, খিঁচিয়ে ছাড়া কথা বলতেন না। তোর মনে আছে? সেই বয়সেই আমার রাগে মাথা জ্বালা করতো!

আমারও। মনে হতো দাদুটা যদি উঠোনের কাদায় পা পিছলে পড়ে

গিয়ে ঠ্যাং ভাঙে বেশ হয়। যদি চান করতে গিয়ে পুকুরে ডুবে যায় বেশ হয়। তার পরিণামে কার কী হবে তা অবশ্য ভাবতাম না।

লালু হাসল—এমন কথাও মনে হতো তোর? কই বলতিস না তো?

নীলু জোরে হেসে ওঠে, বলবো কী? তুই তো আবার ঘরভেদী বিভীষণ ছিলি। বললে মাকে বলে দিবি কিনা কে জানে বাবা। সেই ভয় ছিল। যা 'লাগানে' ছিলি তুই।

লালুও হেসে ওঠে, আমি? তাই বুঝি? তাই ছিলাম না কি?

ছিলিসই তো। মায়ের কাছে আর দাদুর কাছে ভাব দেখাতিস, নিজে কতই যেন ভালোমানুষ। আর বলতিস, 'জানো মা, নীলুটা না—' ব্যস মার বিচারসভায় নীলু কাঠগড়ায়।

আচ্ছা? মা তো সর্বদা শ্বশুরবুড়োর কাছে খিঁচুনি খেতো আর কড়া শাসনের নিচে থাকতো, তবু তাঁকে অত ভক্তি করতো কী করে?

ভক্তি আবার কী? ভয়ে ভক্তি।

না রে দাদা, সত্যি ভক্তিই করতেন। দাদুর পুজোর গোছ করার সময়, জলখাবার গোছানোর সময়, ভাত বাড়ার সময় মুখে যেন একটা পুজো পুজো ভাব দেখতাম!

সে আমিও দেখতাম। লালু বলে, আমার তো মনে হতো সবই ভয়ে।

ভয়ে মুখের চেহারা ওরকম হয়? তাছাড়া দাদু যখন মারা গেল! মায়ের কান্নাটা মনে পড়ে? কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ লাল হয়ে ফুলেই গেছল। সারাক্ষণ কাজ করছেন আর কেঁদে চলেছেন।

লালু বলে, এসব কথা তোর এমন স্পষ্ট মনে ছিল তা কিন্তু কোনোদিন জানতাম না।

নীলু হাসল। আমিও জানতাম না। এখানে এসে যেন হঠাৎ সেই অতীতে ফিরে গেছি। চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি, মা দেশ ছেড়ে চলে আসার সময় ট্রাঙ্কের মধ্যে দাদুর একজোড়া খড়ম ভরে নিচ্ছেন একটুকরো নামাবলীছেঁড়া জড়িয়ে।

লালু বলে ওঠে, দাদুর? সেই খড়মটাই মার পুজোর ঘরে থাকতো নাকি?

তাই হবে। ছিল বুঝি পুজোর ঘরে। তা মা'র ভাগ্যে পুজোর

ঘর হবার পর সেই পুজোর ঘরে। আমি আর কবে ঢুকেছি ? দু' একদিনের জন্যে আসা। তোমার কাছে ছিলেন, তুমি দেখেছ।

লালু বলল, দেখেছি। তবে ভাবতাম ওটা বোধহয় আমাদের পরলোকগত বাবার। তস্য বাবার, তা ভাবিনি।

আমাদের বাবার ? দাদা রে, বৌদি যা বলে মিথ্যে নয়। তোমার সাধারণ জ্ঞানটি বড়ই কম। আমাদের বাবা কোন বয়সে মারা গিয়েছিলেন, সেটা খেয়াল আছে ? বড়মামা একদিন বাবার ছোট্ট ছবিখানা এন্লার্জ করিয়ে নিয়ে এসে বললেন, 'এই রইল তোমাদের বাবার ছবি। পিতৃ-স্মৃতি। বরফি সাইজের যে ছবিখানা তোর মা পুজোর ঘরে রেখে পুজো টুজো করে সেটা খুব ফেড হয়ে গিয়েছিল। তাই ভেবেছিলাম এইবেলা ওইটা থেকে একটা এনলার্জ করিয়ে না রাখলে—' তো সেই ছবিটার নিচে জন্ম তারিখ আর মৃত্যু তারিখের যা হিসেব লেখা ছিল তা থেকে প্রমাণিত, মাত্র সাতাশ বছর বয়সে বেচারাকে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের মায়া কাটিয়ে চলে যেতে হয়েছিল। সেই বয়সে কেউ খড়ম পরে ? আর বাবা তো দাদুর মতো 'টুলো' ছিলেন না। শুনেছি তো দুখানা পাশকরা। রেলের চাকরি—

লালু বললো, তাহলে, মা তাঁর শ্বশুরঠাকুরের পাদুকাই পুজো করতেন। আশ্চর্য ! জগতে কত আশ্চর্যই থাকে। ছেলেবেলার স্মৃতি বড় হয়ে তো আরো ঘোরালো হয়েছিল। 'দাদু' ভাবলেই একটা রগচটা কটুকাটব্য করা সদা রুক্ষ নির্দয় নিষ্ঠুর বুড়োকেই মনে পড়েছে। কারুর ওপর কোনোদিন একটু স্নেহ মমতা দেখেছিস ? মায়া মমতার মধ্যে গোয়ালের গরুগুলোকে। তাদের গায়ে হাত বুলোচ্ছেন, কচি কচি ঘাস এনে মুখে ধরেছেন, এমনকী দু একদিন শালপাতায় মুড়ে জিলিপি খাওয়াতেও দেখেছি। আমাদের কাছে যে জিনিস ছিল প্রায় দুর্লভ। সেই লোককে মা কী করে অত ভক্তি ছেদ্দা করতেন। ভাবা যায় না।

নীলু এখন একটু আস্তে বলে, আসলে এ হচ্ছে সেকালের শিক্ষা আর মজ্জাগত সংস্কার। ওঁদের সেই শিক্ষা সংস্কার হচ্ছে - গুরুজন যাই হোন যেমনই হোন তিনি নমস্য, পূজনীয়। তাই—

থেমে গেল নীলু। 'তাই'টা যে 'কী' সেটি তো আগেই উল্লেখ হয়েছে। স্বর্গগত শ্বশুরের কোনো ফটোটটো ছিল না, এমনকী মৃত্যুর পর যে বুড়োদের পায়ের ছাপ নিয়ে রাখা হয় তাও ছিল না, তাই খড়ম

জোড়াটাই প্রতিনিধি!

লালু বলল. একে তুই ভালো বলিস?

আমি হয়তো বলি না। তবে আমার বলা না বলায় কিছু এসে যায় না। তবে মা চিরদিনই তাঁর বিশ্বাস সংস্কার আর নিজস্ব মূল্যবোধের ধারণা নিয়েই চলেছেন।

আচ্ছা সম্প্রতি চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাওয়া ওই স্বর্ণচাঁপা দেবী নামক মহিলাটি সম্পর্কে তাঁর এই দুই ছেলের আগে কি এমন চিন্তা ধারণা আর বিশ্লেষণী মনোভাবের প্রকাশ দেখা গিয়েছে কখনো? কবে? কখন? তাঁর নামটা যে ছিল স্বর্ণচাঁপা, তাই বা কবে কার মনে পড়েছে? গঙ্গা-মার্কা চিঠি ছাপাবার সময় 'বিগত অমুক তারিখে আমাদের পরমারাধ্যা মাতৃদেবী' লিখে একটু থমকে যোগ করা হয়েছিল, 'স্বর্ণচাঁপা দেবী সজ্ঞানে অমৃতলোক যাত্রা' ইত্যাদি।

তাও নামটা সম্পর্কে উল্লেখ করেছিল লালুর বড় ছেলে পরমেশ্বরের নবপরিণীতা বধূ সর্বোত্তমা। বলে উঠেছিল, ওমা। শুধু আমাদের মাতৃদেবী?' তাঁর একটা নাম ছিল না? যেটা সেদিন পৃথিবী থেকে মুছে গেল। শেষমেষ নামটা একবার উল্লেখ করা হবে না? এমন সুন্দর একখানা নাম।

তা সর্বোত্তমা তো আর স্বর্ণচাঁপার আমলের বৌ নয় যে, শ্বশুরের সামনে একগলা ঘোমটা দেবে আর ঘাড় নেড়ে 'না হুঁ' করেই কাজ চালিয়ে চলবে? এ মেয়ে তো দস্তুরমতো শ্বশুর খুড়শ্বশুরের সঙ্গে গালগল্পও করে। তর্ক করতেও ছাড়ে না।

অতঃপর ওই পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নামটা। নীলু বলেছিল, বৌমা ঠিকই বলেছেন দাদা। নামটা থাক! চিঠির তলায় আমাদের ভালো নাম দেখলেই বা চট্ করে কে চিনতে পারবে? ব্র্যাকেটে 'লালু' আর 'নীলু'টাও দিয়ে দিও ভালোনামের সঙ্গে। নাহলে কেউ চিনতে পারবে না।

অতএব বংশধারার নিয়মানুসারে রাখা পোষাকি নাম দুটোকে 'ভাগ্যহীন' মার্কা করে যেমন লেখা হয়েছিল—ত্র্যম্বকেশ্বর ঘোষাল ও ত্রিগুণেশ্বর ঘোষাল, তার লেজুড়ে ব্র্যাকেটেও লেখা হয়েছিলো লালু, নীলু।

এই ছেলেরা তো আর তাঁদের বাপ ত্রিলোকেশ্বর এবং ঠাকুর্দা

ত্রিভুবনেশ্বর ঘোষালের জন্যে ৺গঙ্গামার্কা চিঠি ছাপিয়ে লোক নেমন্তন্ন করে বেড়াতে পাইনি। এটাই তাদের একটা কাজের মতো কাজ। স্বর্ণ-চাঁপা দেবীর জন্যে তাই চিঠিটি ছাপিয়েছিল সুন্দর করে, বেশ খরচ করে।

শ্রাদ্ধশান্তিও করেছিল রীতিমতো ভালো করে।

না করলে চলবে কেন? দুই ভাই ই তো বিশেষ কৃতি। বড় তো এই সদ্য অবসর নিয়েছেন, এখন 'বড় চাকরির' রমরমা ভাবটা মনের মধ্যে জলজ্যান্ত রয়েছে।

ছোটরও আয় উন্নতি যথেষ্ট ভালো। তা ওদের দুজনেরই মিলিত আত্মীয়সমাজ ছাড়াও নিজের চেনাজানা বন্ধুসমাজ, নিজ নিজ শ্বশুরকুল এবং সম্প্রতি লব্ধ বৈবাহিককুল-সকলের কাছেই তো মানমর্যাদা রাখতে হবে। হেলাফেলা করে মাতৃশ্রাদ্ধ করলে চলবে কেন?

সামাজিক করণ-কারণই তো স্ট্যাটাস বোঝার ক্ষেত্র। তা সে মাতৃদায়, পিতৃদায় বা কন্যাদায় যাই হোক। তবে নেহাৎ একালীনরা আর প্রথম দুটো 'দায়' কে আর তেমন গ্রাহ্য করছে না। ও দুটো নমোনমো করেই সারা হচ্ছে। যত খরচাপাতি তৃতীয় দায়টির ক্ষেত্রে। তা সে যাই হোক স্বর্ণচাঁপার ছেলের মায়েরা শ্রাদ্ধে শ্রদ্ধা প্রকাশই করেছে। কিন্তু মাকে নিয়ে ভাব-ভাবনা করেছে কই?

ছেলে-বৌ নাতি-নাতনী সকলেরই বদ্ধমূল ধারণায় ছিল, স্বর্ণচাঁপা কুসংস্কারের ডিপো, গাঁইয়া একবগগা আর নম্রতার আবরণে ঢাকা অনমনীয় অর্থাৎ সাদা বাংলায় হাড় জেদি।

এই যে নীলু যখন হঠাৎ কলকাতার চাকরি ছেড়ে দিয়ে দুর্গাপুরে চলে গেল একটা দারুণ ভালো চাকরি পেয়ে, তখনই তো দুইছেলে দুই বৌয়ের বৈঠকে স্থির হয়েছিল মা বছরে ছ'মাস ছ'মাস করে দুই ছেলের কাছে থাকবেন।

কেন নয়? না কটু ভাষ্যে কিছু বলা হয়নি, বলা হয়েছে রঙিন রাংতা মুড়ে। নাতি-নাতনীরা ওঁর প্রাণতুল্য, অতএব দু'তরফের প্রাণ-তুল্যদের একনাগাড়ে বেশিদিন বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না।

একদম সুন্দর ব্যবস্থা।

আইনসঙ্গত ব্যবস্থাও বটে।

কিন্তু স্বর্ণচাঁপা সে ব্যবস্থা মেনেছিলেন?

নীলুর কাছে যাবার কথা তুললেই বলেছেন, মনটা তো টানে। ওর ছেলেমেয়ে দুটোও তো 'দিদা দিদা' করে বেড়ায়। কিন্তু দেশটি যে অ-গঙ্গার। বাড়ির কাছেপিঠে মন্দিরটন্দিরও তো নেই। চারদিক যেন কেমন যন্তর যন্তর আর ম্লেচ্ছ ম্লেচ্ছ ভাব। প্রাণ আটকাটিয়ে আসে। ....ওখানে গিয়ে পড়ে ওই ছ'মাসের মধ্যে যদি মরি ?

অর্থাৎ কপালে তাহলে অসদ্‌গতি !

প্রেরক লালু এবং গ্রাহক নীলু দুজনের মধ্যেই থেকেছে একটা আলগা আলগা ভাব। প্রেরক ভেবেছে বেশি জোর করাটা ভালো দেখায় না।

আর গ্রাহক অন্তরালে একটি অদৃশ্য উপস্থিতি অনুমান করে ভেবেছে, বেশি নির্বেদ করলে পরিণামটি সুখের হবে কিনা !

'অগঙ্গার দেশ' 'মন্দির বিহীনতা' এসব ছাড়াও আর একটি কথা উহ্য থাকলেও বুঝতে কারো বাকি থাকতো না, সেটি হচ্ছে বড়ছেলের কাছ থেকে দূরে থাকলে যদি মরণের পর তার হাতের আগুনটি না পান ? অথচ কোলের ছেলেটির ওপর তো টান কম ছিল না। বরং বেশিই ছিল, তথাপি—

এই। এই সবই হচ্ছে লালু নীলুর মায়ের মধ্যেকার চিরকালীন সংস্কার, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, নিয়মনিষ্ঠা।

তো ওই সব ভালো ভালো শব্দগুলো হঠাৎ এখনই মনে আসছে। যেমন মনে এসে গেল—বছর আট আর বছর ছয়ের দুটো ছেলের চেহারা, বাকভঙ্গী, মনোভঙ্গী। কে জানতো ছেলে দুটো দিব্যি জীইয়েছিল অলক্ষ্যে।

এমনিতে এতাবৎকাল ভেবে এসেছে, মার কুসংস্কার গাঁইয়ামি জেদ, এসবই আসলে সুবিধাবাদ'! হ্যাঁ তলে তলে বড় তরফটি তাও ভেবেছে বৈকি।

শেষের দিকে কলকাতা থেকে নড়বার অনিচ্ছায় নীলুর বৌ অবশ্য মনে মনে বলেছে, অগঙ্গার দেশে থাকায় 'বাঁচা গেছে বাবা !' আর মুখে আদরকাড়িয়ে বলেছে, মা তো আমাদের ভালোই বাসেন না। তাই আমাদের কাছে থাকতে পারেন না।

আর বড়বৌ মনে মনে বলেছে, 'গঙ্গার দেশে থাকায়, চোরদায়ে ধরা পড়েছে এই বড়বৌ। আর কিছু নয়, এখানে খাওয়া শোওয়া থাকায়

যেমন আরাম তেমনটি কী ওই ছোটগিন্নীর শৌখিন কোয়ার্টাসে জুটবে ? এখানে বড়ছেলে বাড়ি বানাবার সময়ই তো আগে মায়ের ঠাকুর ঘরটি করেছে। এমন পাবেন ওখানে ?' আর মুখে বলেছে—

'তা মায়ের আচার-বিচার শুচিবাই ছুঁইছুঁইয়ের ব্যাপারটিতে ছোট ছেলের শৌখিনমার্কা কার্পেটপাতা ঘরবাড়িতে ঠিক সুবিধে হয় না। অ্যাতো ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজলই বা ওরা সাপ্লাই দেবে কী করে ? এখানেই মার সুবিধে।'

'নিয়ম-নিষ্ঠা শুচিতা-পরিচ্ছন্নতা' এসব শৌখিন শব্দগুলো যেন হঠাৎ এই নবীনগঞ্জের পুরনো স্যাঁতসেতে বাড়িটার দেয়ালের আস্তরণ খসা ঘরটার মধ্যে দাঁড়িয়ে কোনো তুলে রাখা অভিধানের পাতা থেকে খসে পড়ছে।

দাদুর ঘরে ওই মাকড়সার মশারির মধ্যে ধুলোর কার্পেট গায়ে দেওয়া সিন্দুকটার মতো, কোনো একখানা বৃহৎ সিন্দুক কী অলক্ষ্যে কোথাও পড়েছিল বিস্মৃতির স্যাঁতসেতে ঘরে ? ...সেটাই হঠাৎ—

অথচ এই দেশের বাড়িটা নিয়ে মায়ের সঙ্গে কম তর্কাতর্কি হতো না দুই ছেলের। ছেলেদের যুক্তি, রেখে কী হবে ? মাযের সেই এক যুক্তি, 'স্বামী-শ্বশুরের ভিটে। আমি বেঁচে থাকতে বেচিস না বাপু। আমি মরে গেলে তোদের যা খুশি করিস।'

ছেলেরা বলেছে, কুসংস্কার। বৌরা বলেছে, ওই তো স্বভাব। সব বিষয়ে কাঠকবুল জেদ। 'একাদশীর দিন জলস্পর্শ করব না।' এমন অদ্ভুত অনাসৃষ্টি এখন আর কোথাও আছে না কী ? কী না, সেই কবে কোন জন্মে না কী, কচিছেলের মা তখন ভীষণ গরমের সময় তেষ্টা পেয়ে গিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলতে তুলতে হঠাৎ কুয়োর ঠান্ডাজল এক আঁজলা খেয়ে ফেলেছিলেন আর সেই দৃশ্যটি চোখে পড়ে গিয়েছিল সেই মহাপুরুষ শ্বশুরঠাকুরটিরই। অমনি তিনি বলে উঠেছিলেন 'ছি ছি বৌমা। ছিঃ। এ তো অসংযম। খাবে তো দেখিয়েই খেও।' তদবধি আর সেই 'ছিঃ'র ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। বুড়ো নাকি সেই এক আঁজলা জলজনিত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত বাবদ দ্বাদশীর দিনটিও পুরো নির্জলার ব্যবস্থা করিয়েছিলেন। এমন বিধিনিষেধ মানতে হবে ? তাও চিরজন্ম ধরে ? বয়েসটি কত হলো ভাববেন না ? তা কে শোনে কার কথা।

এক এক সময় দুই জায়ে খুব একতা।

ছোট বলেন, পারেন ওঁরা!

বড় বলেন, জেদই শক্তির জোগানদার। জেদই বলবর্ধক সালসা। আমি বলছি আর কিছু নয় স্রেফ জেদ। ভাবমূর্তিটি যেন নষ্ট না হয়।

ছেলেরা সে দলিলে অনায়াসে স্বাক্ষর দিয়েছে। কিন্তু এখন হঠাৎ ওই 'জেদ' শব্দটা বদলে গিয়ে হয়ে দাঁড়ালো 'নিষ্ঠা' মূল্যবোধ'। তাই তিনি যে সেই নির্মায়িক লোকটার খড়ম জোড়াটাকে নিয়ে আসেন তার ভিটেখানাকে জন্মের শোধ নমস্কার করে চলে আসবার সময়? সেটা জেদ নয়, ভাবমূর্তিটি বজায় রাখা নয়, নিজস্ব বিশ্বাস, নিয়মনিষ্ঠা, মূল্যবোধ।

কিন্তু স্বর্ণচাঁপা নামের সেই রোগারোগা বিধবা বৌটা কী তখন ভেবেছিল 'জন্মের শোধ যাচ্ছি।' সে তো যেতেই চাইছিল না। বলেছিল পাড়ায় তো জ্ঞাতি-ট্যাতিরা রয়েছেন, ছেলে দুটোকে নিয়ে বেশ থাকতে পারবো দাদা।

দাদা বলেছিল, বেশ থাকবি? তা তুই হয়তো বেশ থাকবি। কিন্তু ছেলে দুটোর ভবিষ্যৎ ভেবেছিস? এখানে পড়ে থাকলে ওরা মানুষ হবে? পাঁচ মাইলের মধ্যে তো একটা ভালো ইস্কুল নেই। আর তোর শ্বশুরবুড়ো থাকতে জ্ঞাতিগুষ্ঠিরা যে ব্যবহার করেছে, এখনো তাই করবে ভেবেছিস? ওই আনন্দে থাক। তাছাড়া এই এত বড়—বাড়িখানায় তোর মতো একটা নিরীহ মেয়ের পক্ষে দুটো নেহাৎ বাচ্চা নিয়ে একা থাকায়, কতরকম প্রবলেম এসে জুটতে পারে তা জানিস? আচ্ছা, এখন তো চল! পরে ছেলেরা একটু বড় হলে দেখা যাবে। ওদের ছুটিটুটির সময় মাঝে মাঝে এসে থাকবি না হয় দু'দশদিন।

তা সেই 'দেখে যাওয়াটা' আর ইহজীবনে হয়ে ওঠেনি স্বর্ণচাঁপার। বড় একটা কোনো বাধা ছিল কী? তেমন কিছুই না। শুধু হয়ে ওঠেনি।

হয়তো একপক্ষের মৃদুতা আর অপরপক্ষের সে সম্পর্কে উৎসাহহীনতাই একমাত্র কারণ! ছেলেরা তো কই নবীনগঞ্জে যাবার কথা উঠলে উৎসাহ দেখায়নি। অনায়াসে বলেছে, 'ধ্যাৎ! কে যাবে সেখানে।···· ধ্যাৎ! গিয়ে কী হবে?'

এই কথাটাই পরম সত্যি।

'গিয়ে কী হবে ?'

অথচ স্বর্ণচাঁপা পঞ্চাশ বছর ধরে শুধু ভেবে এসেছেন, আর একবার যদি যেতে পেতাম।

অবশ্য ঘরসংসারী দাদা হলে, কী হতো বলা যায় না। হয়তো গিন্নীতাড়িত দাদা নিজে থেকেই বলতো 'দ্যাখরে চাঁপা, ভেবে দেখছি বাড়িটা এতদিন এভাবে বে-ওয়ারিশ ফেলে রাখাটা ঠিক নয়। এরপর হয়তো দেখবি বেদখল হয়ে গেছে। মাঝেমাঝে কিছুদিনের জন্যে বরং।'

অবশ্যই সেই কিছুদিনটাই' চিরদিন হয়ে যেতো ?

কিন্তু স্বর্ণচাঁপার জীবনে অনুকূলেই বলো আর প্রতিকূলেই বলো, পরিস্থিতিটা ছিল আলাদা। দাদা স্বর্ণচাঁপার থেকে অনেকখানিই বড়ো। মাঝখানে নাকি বেশ কতকগুলি মৃত শিশুকে জন্ম দেওয়ার পর মায়ের ওই স্বর্ণচাঁপা। বয়েসে এতটা ব্যবধান তাছাড়া 'স্বদেশী করা', 'জেলখাটা', চির-ব্যাচিলার দাদা ! তায় আবার বর্তমান রাজনীতিতে নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ। তাই ছোটবোন আর ভাগ্নে দুটোকে নিয়ে সে মশগুল থেকেছে। সেই বন্ধনের গিঁট আলগা করে জোর করে চলে যাওয়া সহজ হয়নি। 'যাব' বললেই দাদা চোখে অন্ধকার দেখেছে আর সাতসতেরো অজুহাত আবিষ্কার করতে বসেছে।

মমতার বন্ধন নাগপাশের থেকেও বেশি জোরালো।

ছেলেদের এই ছুটিটায় যেতে চাস ? আর পুজোর সময়কার কলকাতা ছেড়ে ছেলে দুটোর সেই ধ্যাবধেড়ে গোবিন্দপুরে নিয়ে গিয়ে ফেলবি। তাছাড়া ফিরেই তো অ্যানুয়াল পরীক্ষা। তার থেকে বরং পরীক্ষা চুকে গেলে সেই ছুটিটায় যাব। শীতকালে পাড়াগাঁয়ের জলহাওয়া ভালো থাকে।

কিন্তু শীতের সময় আবার অন্য ভাবনা। যদি ঠান্ডাফান্ডা লেগে অসুখ ধরে যায় কারো। তোরই তো ঠান্ডা লাগার ধাত। অসুবিধের জায়গা, চানের জলটল গরম করতে পারবি কিনা—

চানের জল ! গরম !

মনে মনে হেসেছেন স্বর্ণচাঁপা। সেই নবীনগঞ্জের লোকেরা এহেন একটা শৌখিন শব্দ জানে নাকি। ছেলেদের ওপরও সেই অতি শৈশব থেকেই কড়া হুকুম ছিল ভোরবেলা উঠতে হবে, এবং উঠেই স্নান

করতে হবে।

সে হুকুম মানতেই হতো। ছেলে দুটোকে মনে হতো বলির পাঁঠা। তবু আশ্চর্য। স্বর্ণচাঁপার সেই হুহু হাওয়া-ওড়া দালান উঠোন কুয়োতলা পাঁচিলের ধারের জামগাছটার কথা ভাবলেই মন হু হু করে ওঠে। কে জানে কেন। সেই যে একটি বালিকাবধূ সপ্তাহের একটি দিন দাওয়ায় বসে প্রতীক্ষা করতো একটা উজ্জ্বল আবির্ভাবের প্রত্যাশায়, মনে হয় যেন সেইখানে গিয়ে বসলেই কোনো একটু প্রত্যাশা পূরণ হবে। শনিবারের সন্ধ্যে আর রবিবারের দুটি বেলা। এই তো ছিল সেই বাড়িটার স্মৃতির সম্বল। তাও কতগুলো সপ্তাহই বা! আর দাপুটে ত্রিভুবনেশ্বরের পুত্রস্নেহের এবং তাঁর অভিব্যক্তির অধিকারের পালা মেটার অপেক্ষায় প্রতীক্ষার প্রহর গোনা।

সেই চির অতৃপ্তিই কী চির আকর্ষণ?

স্বর্ণচাঁপার হৃদয়রহস্য স্বর্ণচাঁপার ছেলেদের বোধগম্য হতো না। সেখানে যাবার জন্যে আবার এত কী! তাদের তো সেখানে কোনো আনন্দের স্মৃতি ছিল না। পাড়ার অন্যসব ছেলেদের সঙ্গে খেলবার হুকুম ছিল না তাদের, এমনকী হাতেখড়ি হয়ে যাবার পর পাঠশালায় যাবারও নয়। বাড়িতে মাস্টারমশাই এসে পড়িয়ে যেতেন।

কখনো কখনো যদি তাঁর জ্ঞাতি-ভাইপো এসে কাছে বসতোটসতো, এটা ওটা কথা হতো, তখন শুনতে পেতো স্বর্ণচাঁপা শ্বশুরের সেই ভয় জাগানো ভারী গলা থেকে উচ্চারিত হচ্ছে, 'সর্বদা কাঁটা হয়ে থাকি বলাই, গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে তো!'

এ কথাটা প্রায়ই শুনতে পেয়েছে স্বর্ণচাঁপা তার শ্বশুরের মুখে, 'গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে না? কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে না?'

মানে বুঝতে পারতো না।

তা শীতটা পার করে গরমের ছুটিটাই শ্রেষ্ঠ সময় বলে ঘোষণা করতো দাদা। বলতো, ওই সময়টাই বেস্ট! দেদার আম কাঁঠাল খেয়ে মোটা হয়ে যাবে ছেলেরা। হেসে হেসে বলতো, তোদের ওখানে তো আম কাঁঠালের সময় নাকি কেউ আর রাতে রান্নাটান্না করে না। ওই আম কাঁঠাল মুড়িফুড়ি খেয়েই চালিয়ে দেয়। ভালোই হবে, তোকে আর গিয়ে রাতে রান্না করতে হবে না।

দাদার কথায় স্বর্ণচাঁপার মনের মধ্যে একটু বিষণ্ণ কৌতুকের হাসির

সঙ্গে ভেসে উঠতো একটি দৃশ্য। রাতে রান্নার পাট, সে আবার ও অঞ্চলে ছিল নাকি? কে আবার দু'বেলা ঝঞ্ঝাট পোহায়? সবাই এক-বেলাতেই সেরে রাখে।

শুধু শনিবারের সন্ধ্যেয়—কোনো কোনো বাড়ি থেকে রান্নার শব্দ গন্ধ ভেসে আসতো! যাদের বাড়িতে শনিবারের সন্ধ্যেটা আর রবিবার দুটো বেলায় থাকতো উৎসবের সমারোহের স্বাদ।···সে স্বাদ ছিল এই ঘোষাল বাড়িটাতেও।

কিন্তু কতগুলো শনিবার?

হাতে গুনেই হিসেব করা যায় নাকি?

স্বর্ণচাঁপার জীবন থেকে সেই শনিবারের স্বাদ মুছে গেলে বছরের তিনশো পঁয়ষট্টিটা দিন একই রকম বোবা বিস্বাদ বয়ে আনার পরোয়ানা জারি করে বসলে, দাদা নিতে এসেছিল। বাবার বহু কাতর অনুনয়ের বাণী লিপিবন্ধ করা চিঠিটা হাতে নিয়ে। মা তো ছিল না। শুধু বাবা আর দাদা।

কিন্তু ত্রিভুবনেশবর ঘোষাল সে আর্জিকে এক ফুঁয়ে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। সেখানে আবার কার ভরসায় পাঠাবেন? এখানেও যা সেখানেও তা। 'গিন্নীবান্নীহীন সংসার! এখানে তবু জ্ঞাতি-গুষ্টি পাড়া-পড়শীর মহিলাদের ভরসা আছে। তোমাদের কলকাতায়? কে কার কড়ি ধারে। নাঃ। ঘোষাল বাড়ির ছেলেরা সেই বাড়ির উপযুক্ত হয়েই মানুষ হবে। বড়লোক মামার বাড়ি গিয়ে চাল-চালিয়াতি বিলাস-বাহার শিখতে হবে না।

অতএব তখন দাদাকে একাই ফিরতে হয়েছিল।

কিন্তু ঘোষাল বাড়ির মহিমা'র অহঙ্কার দেখে বোধহয় নিয়তি হেসে ছিল, তাই আবার আসতে হলো দাদাকে! এবং সেবার বোন আর ভাগ্নেদেরকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

স্বর্ণচাঁপার ওজর-আপত্তিতে আবার কে কান দিতে যাবে? তবে তখন শুধুই দাদা। বাবা নেই। দাদা বলেছিল, সেই আসা হলো, শুধু বাবা থাকতে আর—

যেমন এখন ঘোষাল বাড়ির চৌহদ্দিতে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠল নীলু লালু নামের দুটো লোক, 'সেই আসাই হলো। মাকে নিয়ে

আর কখনো একবার—।'

হ্যাঁ, এখানে ওই ধুলোপড়া সিন্দুকটাকে দেখে কোথায় যেন আর একটা ধুলো পড়া সিন্দুকের ডালা খুলে পড়েছে। তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো ওই নিঃশ্বাসটা।

'সেই আসাই হলো। অথচ মা থাকতে আর –'

মামার বাড়িতে তো দীর্ঘদিনই কেটেছে লালু নীলুর। তবে মামী হীন মামার বাড়িতে পরগৃহবাসের যন্ত্রণা ছিল না। সেখানে ওদের মা'ই তো সর্বেসর্বা। মামা রসদ যোগানদার মাত্র। এবং সেই যোগান দেওয়াটাই যেন ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র আনন্দ।

আশ্চর্য, তবুও স্বর্ণচাঁপা নামের মেয়েটা সেখানে তার পুরনো ট্রাংক থেকে সেই নামাবলীমোড়া খড়মজোড়াটা বার করে পুজোর জায়গায় রাখতে লজ্জা পেয়েছে। মুখ ফুটে বলতে পারেনি সেই একটা লোক শুধুশুধুই বলে বসেছিল একদিন আমি যদি মরেটরে যাই বাবার যেন কোনো দুঃখ অসম্মান না হয়।....আর বলেছিল, বিয়ের পর আমাদের দুজনকে নারায়ণের ঘরে বসিয়ে আশীর্বাদের সময় বাবা দুজনকে 'দীক্ষা' দিয়ে দিয়েছিলেন, বুঝতে পেরেছিলে ?

দীক্ষা ?

চমকে উঠেছিল স্বর্ণচাঁপা।

সে কী ! য্যাঃ।

যাঃ নয়। কানের কাছে আসতে কিছু বলেছিলেন মনে আছে। ওটাই 'গুরুমন্ত্র'। বাবা তো পরম গুরু বটেই উনি আবার ডবল গুরু। দীক্ষাগুরু !

স্বর্ণচাঁপা তার বরের অপয়া অলুক্ষণে কথাটার প্রতিবাদ করতে ভুলে গিয়ে বলেছিল, কই এতদিন তো বলনি !

বলিনি ! ভেবেছিলাম হয়তো বাবা নিজেই তোমাকে জানিয়েছেন। তো এখন তো মনে হয়, জানো না ! তাই জানিয়ে রাখলাম।

কিন্তু কেন হঠাৎ জানিয়ে রাখার গরজ হলো তা জিগ্যেস করতে ভুলে স্বর্ণচাঁপা বলেছিল, নিজে কেন ? তোমাদের তো কে যেন কুল-গুরু আছেন।

বাবা তাঁকে তেমন শ্রদ্ধা করেন না।

স্বর্ণচাঁপার মনে হয়েছিল জিগ্যেস করে, নিজেকে খুব শ্রদ্ধা করেন তাহলে ?···সাহস পায়নি।

তা সেই হাস্যকর অবান্তর কথাটা ছেলেদের কাছেও ব্যক্ত করতে সাহস করেননি স্বর্ণচাঁপা। শুনলে হেসে উঠবে বৈ তো নয়। কিন্তু মনের মধ্যে চিরদিন পাক দিয়েছে 'বাবা তো গুরুজন বটেই এতে আবার ডবল গুরু হলেন।'

আচ্ছা, কদিনই বা সেই লোকটাকে নিয়ে ঘর করেছে স্বর্ণচাঁপা ? শনিবারে বাড়ি আসা রেলের চাকরি করা বাবু ছিল তো লোকটা।

আর গোনাগুনীতি কিছু শনিবারে হিসেব ফেলে দিয়ে এমন একখানা রেলগাড়িতে চড়ে বসেছিল যে গাড়ি স্টেশনে পেঁছে আর ফিরে আসে না।

অথচ স্বর্ণচাঁপা যেন চিরটা কাল—সেই ছেড়ে দেওয়া ট্রেনটার ফুটবোর্ডে পা রেখে দাঁড়িয়েছিলেন।

ছেলেদের কাছে চলে আসার পর ? ভারী লাজুক ছিলেন মহিলা। যখন বড়ছেলে বাড়ি করল, স্বর্ণচাঁপা নির্জন নিরালা নিজস্ব একখানা ঠাকুরঘর পেলেন তখন যেন বর্তে গিয়ে চুপিচুপি পুরনো ট্রাঙ্ক থেকে সেই নামাবলীর টুকরো জড়ানো খড়মজোড়াটাকে বার করে স্বামীর সেই এনলার্জ করা ফটোটার কাছাকাছি রাখলেন। তো, কে আর খোঁজ নিতে যাচ্ছে ওটা 'কী' ? 'কেন ?' 'কার ?'

বাহান্ন বছর বৈধব্য পালন করে অবশেষে দেহরক্ষা করেছেন স্বর্ণচাঁপা দেবী।

ভুগেছিলেন বেশ অনেকদিনই।

ত্রিলোকেশ্বর নামের লোকটার হার্ট এক ঘণ্টার নোটিশে জবাব দিয়েছিল, কিন্তু স্বর্ণচাঁপার হার্টটা এতই স্ট্রং ছিল যে, বারেবারে নোটিশ দিয়েছে, তবু সহজে জবাব দিয়ে বসেনি।

লালুর শাশুড়ী আড়ালে বলেছিল, 'অকাল বৈধব্য মেয়ে-মানুষের পরমায়ু বাড়ায় এ প্রবাদটা দেখছি মিথ্যে নয় !'

তবু তেমন তেমন সময়ও বলেছেন স্বর্ণচাঁপা, মরার আগে শেষমেষ একবার সেখানে নিয়ে চল নারে—'

'সেখান' কথাটার মানে সকলের জানা।

ছেলেরা সেই কাতরতায় গলেছে নাকি ? হেসে উঠেছে। বলেছে. 'পাগল না মাথা খারাপ।' সেখানে আবার যাবে কী! গিয়ে দাঁড়াবার জায়গা আছে মনে হয় ? তোমার সেই প্রাণের শ্বশুরের ভিটেটি এখনো টিকে আছে ভাবো ?

রেগে ওঠা স্বভাব ছিল না স্বর্ণচাঁপার রাগটা প্রকাশ করতেন মৃদু ক্ষোভের হাসিতে। বলেছেন, তোরা কি কখনো টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিস ? তোদেরই ভিটে।

আমাদের অমন ভিটে-ভিটির সেণ্টিমেণ্ট নেই। ফর নাথিং বাজে খরচ। লাভ আছে কিছু ? কেউ সেখানে গিয়ে বাস করব ?

তা মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেও তো পারা যায়। বছর বছর কত কত খরচা করে এখান ওখান তো যাসও।

সেটা বেড়াতে যাবার জায়গায় যাওয়া হয়। তোমার নবীনগঞ্জ একখানা আদর্শ বেড়াতে যাবার জায়গা নয়।

'তোমার নবীনগঞ্জই' বলে ওরা চিরকাল।

অথচ সেই স্বর্ণচাঁপার শ্রাদ্ধসভাতেই হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল, 'নাঃ, একবার যাওয়া দরকার।'

দরকারটা অবশ্য মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন সেখানকারই একজন। স্বর্ণচাঁপার শ্রাদ্ধকাজের জন্য দেশের পুরুতকে আনিয়েছিল ছেলেরা। বলেছিল. মা ওই সেখানের নারায়ণসেবার সেবক কী যেন ভটচায্যিকে খুব ইয়ে করতেন। তাছাড়া—এখানে আর আমাদের পুরুত-টুরুত কোথায় ?

লালুর বৌ বলেছিল, আমার বাপের বাড়িতে অবশ্য আছেন পুরুত। খুব ভালো পুরুতই। মা তো বারোমাস 'সত্যনারায়ণ দেন', তাছাড়া—

লালু হঠাৎ ওই তাছাড়া-র শেষ না শুনেই বলেছিল. নাঃ ওই সাধন ভটচায্যির ছেলে মোহন না কে, যার নামে মাসে মাসে টাকা পাঠানো হয়, তাকেই তলব করা হোক। মাঝে মাঝে মার কাছে আসতোও যেন লোকটা।

তা তিনি এলেন, মা-ঠাকরুণের জন্যে বহু হা হতাশ করলেন, এবং তারপরেই ব্যক্ত করলেন, তা ভিটেখানা কেন পাঁচ ভূতের ভোগের

জন্যে ফেলে রেখেছেন দাদা? বেচে দিন না। ভালো দাম পাবেন। এখন ওখানে জমিজমার সোনার দর!

সোনার দর। সে আবার কী।

অ্যাঁ। কবে এমন হলো? ধুলোমাটির দরের হিসেবের খাতায় ফেলে রেখেছিল যে! কই এতদিন তো—

আজ্ঞে অনেকদিন থেকেই বেড়েছে। আর এখন তো মওকা পেয়ে জ্ঞাতি-গুষ্ঠী হাতাচ্ছেও। বেড়া ভেঙে নতুন বেড়া দিয়ে নিজেদের জমি মাপাচ্ছে।

বেড়া ভেঙে নতুন বেড়া দিয়ে নিজেদের জমি মাপাচ্ছে?

নীলুর বৌ ফস করে বলে ওঠে, তার মানে নিজেদেরটা বাড়াচ্ছে?

তবে আর বলছি কী! তবে দোষও দেওয়া যায় না। বেওয়ারিশ পড়ে আছে তো। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তো কেউ একদিনের জন্যেও— সবই যেতো। নেহাৎ ওই নারায়ণসেবার সূত্রে বাবা বুক দিয়ে রক্ষে করতেন তাই এখনো আছে। বাবা গত হবার পর থেকে আমিও যতটা ক্ষমতা দেখিটেখি। এতে আবার আমি পাঁচজনের চক্ষুশূল। বলে, 'যাদের জিনিস, তাদের হুঁশ নেই তোমার এত কী হে?'

নীলু একটু আস্তে বলেছে যাওয়া-টাওয়া না হলেও, মা তো যোগাযোগ রেখে এসেছেন।

মোহন ভটচায্যি পুজোর আসনে বসেই একটু কাৎ হয়ে বিড়ি টানছিল, এখন পোড়া বিড়িটা ছাতের কোণের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে হ্যাঁ। তা ঠিক। তো সেইটাই সবাইকে বলি। তবে কী জানেন দাদা, আগে তো গাঁ-ঘরের জমির তেমন মান মর্যাদা ছিল না। বিঘে দরে ছাড়া, কেউ কখনো কাঠা দরে জমি কেনাবেচা করেনি। তো নিজেদেরই কতজনার এলোমেলো জমি থেকেছে। অপরের জিনিসের দিকে তেমন নজর দেয়নি। এখন বেচাবেচির স্বাদ পেয়ে লোভ জন্মাচ্ছে। মনে হয়, গিয়েছে আপনাদের বেশ কিছু। তবে ফেলেছড়েও এখনো যা আছে, কোন না পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা হবে।

পঞ্চাশ-যা-ট হাজার।

বলে কী লোকটা।

ধাপ্পা দিচ্ছে, না ভাঁওতা দিতে এসেছে?

এই হাড়গিলে চেহারার বিড়িখেগো লোকটা মাঝে মধ্যে মায়ের

কাছে আসতো বটে, তবে দেখলে সকলেরই বিষ উঠতো। আরো বিষ উঠতো মায়ের সেই 'দেশের পুরুতের ছেলে' বলে তদগদ তটস্থ ভাব দেখেই। ওর জলখাবার সাজানোর থালা দেখে মার যেন মনই উঠতো না।

লোকটার সঙ্গে বাড়ির কেউই বিশেষ কথা বলতে আসতো না, যা বলতেন মা। এরা নিশ্চিত জানতো ওই গুজগুজ করে কথা বলা লোকটা মার কাছ থেকে নির্ঘাৎ কিছু টাকা-পত্তর হাতিয়ে যায়।

মা পাবেন কোথা থেকে ?

তা দুই ছেলে তো নিয়ম করে মাকে 'হাতখরচ' বলে কিছু কিছু দিয়ে এসেছে। ইদানীং আবার নাতিও লায়েক হয়ে, শখ করে দিতো কিছু কিছু। হেসে হেসে বলতো, এটা তোমার 'স্পেশাল'। সিনেমা-টিনেমা দেখবে, ইচ্ছে হলে রেষ্টুরেন্টে গিয়ে দুটো ভালমন্দ খাবে।

বুড়িও হেসে হেসে বলতো, এ কাঠামোয় তো আর হবে না। আসছে জন্মে হবে। দে তুলে রাখি।

আসছে জন্মে তোমার এই টাকা-পত্তর থাকবে ?

বুড়ি আরো হাসতো, 'দাদন' দিয়ে রাখবো। না কি তোরা যে ওই কী বলিস ব্যাংকে 'ফিকস ডিপোজিট', তাই রাখবো। যাতে আসছে জন্মে —সুদে আসলে পেয়ে যাই।

তা স্বর্ণচাঁপা নামের সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মহিলাটি জানতেন দেব-দ্বিজ সেবাই হচ্ছে 'দাদন' দিয়ে রাখা, ব্যাংকে ফিকস ডিপোজিটে রাখা।

কিন্তু সেটা তো তাঁর ছেলেদের মনে হবার কথা নয়। তাই 'দ্বিজ'র প্রতিনিধিস্বরূপ লোকটাকে দেখলেই ওদের হাড় জ্বলে যেতো। কথা কইবার ইচ্ছে হতো না।

মায়ের ওই শ্রাদ্ধসভায় সেদিন হঠাৎ লোকটা কেমন যেন পাত্তা পেয়ে গেলো। ছেলে-বৌরা তার কাছাকাছি ঘেঁষে এসে বসল। কাজ হয়েছিল ছাতে প্যান্ডেল করে। সেখানেই ষোড়শদান সাজানো হয়েছিল, এবং কীর্তন গান হচ্ছিল। তখন কীর্তনের ধ্বনি থেমেছে। নিরিবিলি ভাব এসেছে।

লালুর বৌ বলল, আগেও তো আপনি এসেছেন ঠাকুরমশাই, কই বলেননি তো ওখানে এখন—

মাঠাকরুণকে বলতুম। তিনি তো বলতেন 'আমার প্রাণ থাকতে ভিটে বেচার কথা মুখে এনো না মোহন!'...আর আপনাদের কানে তুলতেও মানা করতেন।

লালুর বৌ মনে মনে বলেছিল, ওঃ সেই চিরকালের পলিটিকস্। দেখলে মনে হতো যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। অথচ প্যাঁচ ভালই জানতেন।...মুখে বলেছিলো, তো এখন তো আর তিনি রইলেন না। এখন আর সে সেণ্টিমেণ্ট নিয়ে কী হবে? বরং অন্যরা বেদখল করে নিলে মা'র আত্মা কষ্ট পাবে।

অ্যাঁ। ঠিক তো। 'আত্মা' বলে একটা জিনিস আছে না? তার কথা তো ভাবা হয়নি।...সবাই যেন চমকে উঠে অবহিত হলো।

নীলুর বৌ বলে উঠল, তা এই কাজকর্ম মিটে যাবার পর তোমাদের একবার সেখানে যাওয়া উচিত! তাতে মায়ের আত্মা শান্তি পাবে।

নীলুর বৌয়ের মা সায় দিয়ে বললেন, রমু ঠিক কথাই বলেছে বাবা। বেয়ান সাতজন্মে যেতেন না বটে, তবে 'ভিটে' বলে খুব টান ছিল বোঝা যেতো।

অতএব গোলটেবিল বৈঠকে ঠিক হলো অবিলম্বে একবার মার ছেলেদের 'সেখানে' যাওয়া দরকার। কী বা এখন মামলা। এই তো ঠাকুরমশাই ভোরের গাড়িতে এসে কাজকর্ম মিটিয়ে আবার রাতের গাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন। সেই মতোই হতে পারবে। শুধু ট্রেনের টাইমটায় 'আপ ডাউনের' হিসেবটি জেনে নিতে পারলেই –

কিন্তু মোহন ভটচায্যি সে প্রশ্ন উড়িয়েই দিলেন। বললেন, ক্ষেপেছেন দাদা। একবেলায় কাজ মিটবে? আপনাদের কোথায় কী আছে, তাই দেখে বুঝতেই, না হোক, দুটো দিন যাবে। একদিনে ফিরে আসা! ও চিন্তা ছাড়ুন।...

অর্থাৎ ভটচায্যি যেই দেখলেন বেশ একটু পাত্তা পাচ্ছি, সেই আত্মস্থভঙ্গী আয়ত্ত করে নিলেন। অনায়াসে বললেন, 'ক্ষেপেছেন দাদা।'

তবু খুব একটা হাড় জ্বলে গেল না কারুর।

তবে কথা হচ্ছে—গিয়ে দু'দিন বাস করা যায় এমন অবস্থা আছে সে বাড়িটার?

এ প্রশ্নে অট্টহাস্য ছাড়া আর কী হতে পারে!

বাস করা? সে বাড়িতে? ঢুকতে হলেই তো আগে মজুর

লাগাতে হবে দাদা। উঠোন ভর্তি গাছপালা লতাপাতার জালে দরজা জানলাগুলো আষ্টেপিষ্টে জব্দ হয়ে বসে আছে। আর ভেঙে পড়েছে তো অনেক জায়গাই, সর্বত্র গাছ গজিয়েছে। কুয়োটা থেকে আগে পাড়ার লোক জল নিতো সেই স্বার্থে দ্যাখভাল করে টিকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় টিপকল বসে যাওয়ায় কুয়োর আদর কমে গেছে। অতএব সেও অভিমানে 'পড়ে' বসে আছে। আপনাদের ওই কুয়োটার জল খুব মিঠে ছিল দাদা।

তা বাড়ির মধ্যে যদি ঢোকাই না যায়, দু'দুটো লোক সেখানে যাবে কী করে? কাছেপিঠে হোটেলফোটেলও তো আছে বলে মনে হচ্ছে না।

হোটেল!

শুনে মরমে মরলেন মোহন। তারপর উষ্মার কণ্ঠে বললেন, আপনাদের পিতামহ আর আমার বাবার সঙ্গে ছিল বিশেষ স্নেহের সম্পর্ক। বাবা তাঁর কাছে অনেক সাহায্য সহায়তা পেয়েছেন। মনে করবেন এই গরীবের কুটিরটুকু আপনাদেরই। ওখানেই দুটোদিন—

না না সে কী করে সম্ভব হয়?

কেন নয়?

আপনার বাড়ির মহিলাদের কষ্ট দেওয়া।

বাড়ির মহিলা? মানে আপনাদের বৌমা? আপনারা গেলে যত্ন করতে পেয়ে বর্তে যাবে।

কে বলবে এই লোকই প্রথম এসে এমন স্বরে কথা বলছিল যে শোনাই যাচ্ছিল না। এখন স্বর উদাত্ত।

জেরায় জেরায় জানা গেল, আগ্রহের কারণটি মোহনের সম্পূর্ণ 'নিরামিষ' নয়। এ বাজারে শুধু যজমানি করে আর সংসার চালানো যায় না বলে, তিনি জমি কেনা-বেচার দালালি ধরেছেন শুধু জমি কেন, পোড়োবাড়ির ইঁট, কাঠ, তাদের ফেলে-যাওয়া ডেয়ো ঢাকনা বাসনপত্র, এবং গাছটাছ কী নয়?

ওমা গাছ আবার বিক্রী করা যায়?

নতুর বৌ অবাক প্রশ্ন করে বসে।

মোহন হাস্য করেন, যায় বৈকি মা লক্ষ্মী।

কাঁঠালের তো কথাই নেই। এখন এক একখানা আম জাম জারুল-

ফারুলেরও বাজার দর দারুন। আর তেঁতুলের? তার তো কথাই নেই। এক একটা গাছ সাত আটশো থেকে হাজার টাকায়। তা তোমার নিজেদের ভিটের উঠোনেই তো গোটা তিনেক তেঁতুল গাছ।

শুনতে শুনতে স্বর্ণচাঁপার বৌরা ঠাকুরমশাইয়ের খাবার ব্যবস্থা করতে স্বর্ণচাঁপার মতোই তৎপর হলেন এবং আর একবার অভিমত ব্যক্ত করে, বললেন একবার যাওয়া উচিত। অবশ্য আড়ালে এ কথাটা ব্যক্ত করে ঠাকুরমশাই যদি জেনে যান, আমাদের তেমন গা নেই পরবর্তী ঘটনা কী হতে পারে কে জানে। এতদিন মা ছিলেন তবু প্রাণে একটু ভয় ছিল। তাছাড়া জেরায় জেরায় যেন জানা গেল 'পঞ্চাশ ষাটটা বেশ কিছু মার্জিন রেখেই বলা হয়েছে।

তবে বেচে দেওয়া তো এক দুদিনের কথা নয়। ক্রেতা অবশ্য মোহনের হাতেই আছে ভালো ক্রেতাই। কিন্তু কেনাবেচা কী অত সোজা? পর্চা 'দলিল' 'খতিয়ান' 'দাগ নম্বর' মিউনিসিপ্যালিটি ট্যাক্স দাখিলের রসিদ' এসব দাখিল করতে হবে তো!

দলিল! খতিয়ান! দাগ নম্বর! এ সব কোন জগতের ভাষা? কোন স্বর্গ থেকে পাওয়া যাবে সে সব?

কিন্তু মোহনের আজ বরাভয় মূর্তি।

আপনারা মা ঠাকরুণের বাক্সপ্যাঁটরা খুঁজলেই পাবেন। আমার বাবার কাছেই রাখা ছিল, নারায়ণের ঘর সমেত সব জমিটমির। তো বাবার মৃত্যুর পর মা ঠাকরুণকে সব ধরে দিয়ে গিয়েছিলুম। যাতে আপনাদের বলে বেচার ব্যবস্থা করেন। বাবা সেই কথাই বলে গেছিলেন। তো— 'তো' আর কী।

এখন অতঃপর স্বর্ণচাঁপার বাক্স-পাঁটরা হাতড়াতে হবে।

সত্যি কী বোকামি।

কী লোকসান!

কী পাগলামিই করে এসেছেন মহিলা। তাঁর জীবদ্দশায় একটা ফয়সালা হলে তবু তো স্বামী শ্বশুরের ভিটে বাবদ, টাকার গোছাটা হাতে ধরতে পেতেন। অন্তত চোখেও দেখে যেতে পারতেন।

অত দামী জিনিসটা পাঁচ ভূতে লুটেপুটে শেষ করছে! ছি ছি!

এ জিনিস আর হতে দেওয়া যায়?

ষাট সত্তর হাজার। রাস্তায় ফেলে দিয়ে রাখা হয়েছে।

ভাবা যায় ?

শুনে তো মনে হচ্ছে লোকটার নিজের স্বার্থ থাকলেও ধাপ্পা দিচ্ছে না, ভাঁওতাবাজি করছে না। সত্যিই এখন বাজারদর ওই রকমই।

যাক, দেখতে তো যাওয়া হোক !

অতএব সেটা হলো।

সর্বোত্তমা বলে বসেছিল, কাকা আমি আপনাদের সঙ্গে যাই না ?

তুমি ? কী যে বল মা ? শুনলে তো অবস্থা।

তার জন্যে তো আপনারাই দায়ী কাকা। এতদিন যাননি কেন ? বাড়ির বৌ, তাকে একবার দেশের বাড়ি দেখানো উচিত ছিল না আপনাদের ? নাকি ?

আরে বাবা ! বাড়ি কোথায় তার ঠিক নেই। তোমার শাশুড়ীরাই দেখেছেন কী ?

কী আশ্চর্য ! নিজেদের জন্মস্থান, যেখানে ছেলেবেলাটা কেটেছে, সেখানটা ওদের দেখাতে ইচ্ছে করেনি ? দেখাতে হয়। শেকড় চেনানো দরকার।

আর চেনানো।

লালু বলেন, এখন তো শেকড় উপড়োতেই যাওয়া।

এ মা। বাঃ। তার আগে আমায় একবার দেখাবেন না ? দিদার কাছে কত কিছু গল্প শুনেছি।

হ্যাঁ, নাতবৌয়ের কাছে সেই কোন অতীতের কথা বলেছিলেন কিছু স্বর্ণচাঁপা। কত কিছু ? সে আর পাবেন কোথায় ? যেটুকু সঞ্চয় তাই থেকেই। বৌরা তো কোনোদিন কান দিয়ে শোনেনি। নাতবৌটি একটু অন্য ধরনের, নিজে থেকেই বলেছে গ্রামকে অবহেলা করেই আজ আমাদের দেশের এমন অবস্থা দিদা। সবাই কেবল গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে এসে শহরে ভিড় বাড়িয়েছে সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্যের আশায়। এখনো তাই করছে। কিন্তু 'বুদ্ধিমান' দেশে গ্রামেই শহরের সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য এনে এনে তাকে টিঁকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে।

তা এখন নাকি ছবি অন্য।

ব্যবসায়ীদের লোভের থাবা এগোতে এগোতে গ্রামকে ছুঁয়ে ফেলছে আর তার শিকড় উপড়ে ফেলে তার সবুজ বিনষ্ট করে ধোঁয়ার চাষ

করতে চাইছে কারখানা খুলে। কিন্তু সেই বহিরাগতর কল-কারখানায় কী গ্রামের ছেলেরা কাজ পাচ্ছে। তাদের সামনে একটা নতুন দিগন্ত খুলে যাচ্ছে?

কই আর?

কাজ যারা পাচ্ছেটাচ্ছে তারাও বহিরাগত। তাদের সঙ্গে সে গ্রামের মাটির কোনো যোগ নেই।

লালু ছেলের বৌকে আপাত সান্ত্বনা দিতে বলেছেন, আচ্ছা! আচ্ছা! কালই তো গিয়ে সব হস্তান্তর করে আসছি না। এসব কাজ চট করে হয় না। অবস্থা দেখে আসি। তারপর না হয় ব্যবস্থা করে নিয়ে যাব তোমায়।

কিন্তু তখনও কী মনে হয়েছিল মাকে কোনোদিন মুখে প্রবোধ দিতেও এমন অবাধ আশ্বাসের কথা বলিনি। নাঃ মনে পড়ে না।

মা যাবার কথা তুললেই বলেছেন, ওই! হলো শুরু—সেই পাগলামি! কোনো মানে হয় না। হয়তো সাপখোপের আড্ডা হয়ে পড়ে আছে।

তখনও—অর্থাৎ যখন স্বর্ণচাঁপার পুরনো স্টীলট্রাঙ্ক হাতড়ে সাধন ভটচায্যির কাছে থাকা দলিলপত্রের বান্ডিল পেয়ে গিয়েছিলেন মোহনের কথা মতো তখনও বলেছিলেন মার এই বোকামির কোনো মানে হয় না। এতবড়ো ঘটনাটা আমাদের কাছে চেপেও তো রেখেছিলেন। আশ্চর্য!

ঘটনাটা প্রকাশ পাওয়ায় বৌদের কাছে যেন বেশ একটু অপ্রতিভই হয়েছিলেন ছেলেরা। বৌদের অনুক্ত ভঙ্গীর মধ্যে যেন ছিল, দ্যাখো! দ্যাখো এবার তোমাদের মা-টি কতো সরল ছিলেন। হুঁঃ ভেতরে ভেতরে ঢের প্যাঁচ ছিল।'

কিন্তু এখন?

ছাপ্পান্ন আর আটান্নর দুটো লোক যখন হঠাৎ কোন মন্ত্রে ছয় আর আট হয়ে বসেছে?

তখন একজন আস্তে বললেন, সেই আসাই হলো, শুধু মাকে নিয়ে আর—

আর সেটা শুনে অন্যজন নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সত্যি। খুব খারাপ হয়েছে। আসলে—

'আসলে' যে কী সেটা আর বলল না। তারপর আবার দুটো ছোট-

ছেলে ঘোষালদের ভাঙা ভিটের ইঁট পাটকেল বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকলো।

উঃ। সবই প্রায় ভেঙে পড়ে গেছে। কোনখানটা কী ছিল তোর মনে পড়ে নীলু? তোর তো স্মৃতিশক্তি বেশি।

নাঃ। ঠিক বুঝতে পারছি না। এখানটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। রান্নাঘরটা কোথায় ছিল? যেখানে মা সারাদিন পড়ে থাকতো।

এইখানটাতেই ছিল কোথাও। ওই যে ভাঙা কুয়োটা দেখা যাচ্ছে। কুয়োর কাছেই ছিল না? মা সেই পেতলের একটা কলসিতে দড়ি বেঁধে সেটাকে নামিয়ে নামিয়ে জল তুলতো।

দাদা। গরুটরুগুলোও সব গেছে না? তাদের ঘর টরও। মনে আছে গরুগুলোকে খুব হিংসে করতাম আমি, দাদু যেদিন তাদের জিলিপি খাওয়াতো। আচ্ছা দাদা, নাতিদের না দিয়ে গরুকে খাওয়ানো, এই সাইকলোজির মানেটা কী বল তো?

'দাদা' দুটো হাত ওল্টালো।

যেটা আদৌ কোনো ভালবাসার জিনিস ছিল না, যেটা এত এতকালের মধ্যে মনের কোণেও ছায়া ফেলেনি, সেটা হঠাৎ এমন আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো কী করে? আশ্চর্য তো।

তবে ওরা সেটা খেয়াল করছে না। ওরা ওদের খোলস থেকে বেরিয়ে পড়ে, মালকোঁচা মেরে ছোট ছোট ধুতি পরা খালি-গা দুটো ছেলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যে ছেলে দুটো সব কিছুতেই কৌতূহল দৃষ্টি ফেলতে চাইছে।

আমরা কোন ঘরটায় শুতাম রে নীলু? সেই একটা চৌকিতে; মা মাঝখানে আমরা দু'পাশে।........রোজ ঝগড়া হতো, মা কার দিকে ফিরে শোবেন বলে।

মনে হচ্ছে, এই ঘরটাই। এই দ্যাখো বাগানের দিকের জানালাটার ধারে দাঁড়ালে, ওই লালমতন বাড়িটা দেখা যেত। বাড়িটা রয়েছে এখনো।

মা বেচারী কোনোদিন পাশ ফিরে শুতে পেত না দাদা—ছেলে দুটোর জ্বালায়। সোজা লম্বা হয়ে ঘুমোতে হতো ওদের ঝগড়ার ভয়ে।

খুব ঝগড়াটে ছিলাম আমরা না?

ধ্যেৎ! ছোটোবেলায় আবার কে না ঝগড়া করে? নিজেদের বাড়িতেই দ্যাখো না। এযুগের ওরা কত পাচ্ছে। পেয়ে পেয়ে উপছে পড়ছে তবু ভাইয়ে ভাইয়ে কি ভাইবোনে ঝগড়া করতে ছাড়ে? হয়তো সামান্য একটা ডটপেন নিয়েও করে। আসলে ওই ঝগড়াটাইই ভালবাসার প্রকাশ।

তা হবে।

তা হবে নয়, তাই! ভাবই কী কম ছিল আমাদের? তোমার মনে আছে দাদা, আমি একদিন দাদুর একটা পাথরের গেলাস ভেঙে ফেলেছিলাম বোধহয় দাদুর ডাব খাওয়া গেলাস, তো আমি তো দাদুর ভয়ে কাঁটা। তুমি নিজের ঘাড়ে দোষ নিতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলে, এই যাঃ। গেলাসটা ভাঙলাম।

আরে! কই? এ সব আবার কবে হয়েছিল?

কবে হয়েছিল, তা জানি না। তবে হয়েছিল একদিন। দাওয়া থেকে নামার এই সিঁড়িটার ধারে। মনে হচ্ছে ভাঙা গেলাসটা যেন ওইখানেই পড়ে আছে।

অনেক কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তবু এক একটা তুচ্ছ চিহ্ন এমন অদ্ভুতভাবে ধাক্কা মারছে।

দ্যাখ দ্যাখ। দালানের এই কুলুঙ্গিটার মধ্যে বোধহয় একটা 'ঢিবড়ি' নাকি জ্বলতো, তার ভূষোটা ঠিক তেমনিভাবে রয়ে গেছে কুলুঙ্গিটার মধ্যেকার দেয়ালে। পঞ্চাশ বছরের পথ পার করে দিব্যি বসে আছে।

নীলু হেসে ওঠে, কালি কিনা। সহজে মিলোয় না।

দাদা! দেখছো। তিনটে তেঁতুল গাছ। মার ওই মোহন পুরুত যাদের কথা বলেছিল সেদিন। আজও বলছিল, কাঠ এখন সোনা তুল্য। তেঁতুল কাঠের খুব দাম।

আচ্ছা নীলু, তখন কী এখানে তেঁতুল গাছগুলো ছিল?

কী জানি! দূর! তাই কী থাকে? হিসেব করে দ্যাখ। সেটা পঞ্চাশ বছর আগের ব্যাপার।

তেঁতুল গাছের পরমায়ু কত হয় কে জানে! ওই পুরুতমশাইটি সেদিন বলছিল, জাম জামরুল নিম তেঁতুল পেয়ারা এসব গাছ আর কে পুঁততে যায়? আপনিই হয়। তো আগে এসব কে বা পুঁততো? এখনই –

খোয়াখন্দ পেরিয়ে ভাঙা ইঁটের বোঝায় হোঁচট খেয়ে গাছগুলোর

কাছে চলে আসে ওরা।

আর এসেই তক্ষুণি নীলু রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে, দাদা, এগুলো আমাদের সেই চুরি করে খাওয়া তেঁতুলের বীচি থেকে জন্মানো নয় তো?

চুরি করে খাওয়া। সেটা আবার কী?

বাঃ। তোর কিছু যদি মনে থাকে! মনে পড়ছে না, মা এইখানটায় কোথায় একটা কুলোয় করে আস্ত আস্ত তেঁতুল শুকোতে দিত, আর আমরা চুরি করে খেতাম।

তা হবে।

তা হবে কী রে দাদা? মনে পড়ছে না? একদিন দাদু দেখে ফেলার ভয়ে খেয়ে উজাড় করা তেঁতুলের বীচিগুলো, কোথাও না ফেলে একটা গর্ত করে পুঁতে ফেলেছিলাম। খুব করে মাটি চাপাও দিয়েছিলাম। মনে পড়ছে না।

বলছিস, তাই মনে পড়ছে।

আমার মনে হচ্ছে এই গাছগুলোর জন্মের ইতিহাস তাই। সেই আমাদের পুঁতে ফেলা বীচিগুলো থেকেই। ভটচায্যি তো বলছিল, ওসব গাছ এমনিই হয়। এইভাবেই হয়। আচ্ছা জিগ্যেস করবো, তেঁতুল গাছ জন্মে বড় হতে কতদিন লাগে আর কতদিন পর্যন্ত বাঁচে।

যেন ওই পরম খবরটা জানা দারুণ জরুরি। যেন যেই টের পাওয়া যাবে হ্যাঁ 'এরাই তারা' তাহলে ভয়ানক দামী একটা কিছু পেয়ে যাবে।

কিন্তু তারপর?

কার কাছে সেই পরম প্রাপ্তির গল্পটা করা হবে? বাড়ির সকলের মুখ মনে পড়ল। নাঃ, কারুর কাছেই আহ্লাদে ভেসে বলে ওঠা যাবে না, 'জানিস। আমাদের সেই ছেলেবেলায়—চুরি করে খাওয়া তেঁতুলের বীচিগুলোকে দাদুর চোখ থেকে হাপিস করে ফেলবার জন্যে বুদ্ধি করে পুঁতে ফেলেছিলাম, তাই থেকে ইয়া প্রকাণ্ড তিনটে তেঁতুল গাছ।'

অভিভূত হওয়া দূরে থাক। এটাকে কেউ একটা খবর বলেই মনে করবে না।

কিন্তু কিছুদিন আগে যদি আসা হতো? মাকে গিয়ে বললে—মা শুনলে নিশ্চয় ছেলেমানুষের মতো আহ্লাদ করতো।

যে স্বর্ণচাঁপা দীর্ঘকাল যাবৎ বেঁচে থেকেও সংসারে মৃতের ভূমিকায় থাকতো, এবং কেউই তাতে কিছু অস্বস্তি অনুভব করতো না, মনে হতো এটাই স্বাভাবিক, এখন হঠাৎ তাঁর সম্পর্কে একটু অপরাধী অপরাধী মনোভাব দেখা যাচ্ছে ছেলেদের মধ্যে। মনে হচ্ছে মার সম্পর্কে তেমন কেয়ার নেওয়া হয়নি।

অন্ততঃ একবারও যদি মাকে নিয়ে আসা হতো।

তাহলে মাকে জিগ্যেস করা যেতো, আচ্ছা মা, বল তো যেখানটায় বসে তুমি কুটনো কুটতে সেই জায়গাটা কোনখানটা? ···তার ধারে কাছেই তো তুমি আমাদের ধামার মতন দেখতে ছোট ছোট কেমন একরকম চুপড়ি করে মুড়ি খেতে বসিয়ে দিতে। বলতে এই এক জায়গায় চুপচাপ বসে খা। সারাবাড়ি ছড়াবি না। দাদু দেখলে রাগ করবে।

'আমাদের' মানে মা এবং আমাদের দুজনের জীবন নিয়ন্ত্রিত হতো 'দাদু' নামক এক বিভীষিকার রুদ্রছন্দে।

তবু পুজোর ঘরে দাদুর খড়ম রেখেছিল মা। অদ্ভুত।

দাদা। দ্যাখো দ্যাখো দেয়ালে সেই আংটা দুটো একইরকম আছে। তখনো তো এমনি মরচে ধরা ছিল। এ দুটো দিয়ে কী হতো বল তো?

কই কিছু হতে দেখিনি। শুধু দাদু বাড়ি না থাকলে ওর মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দোল খেতাম।

আমার হাত যেতো না। তাই তোমার ওপরে হিংসে হতো। হা হা হা। ছেলেবেলায় কী হিংসুটে ছিলাম আমি।

অকপট স্বীকারোক্তি।

কিন্তু সে তো আর 'নীলু' নামক ব্যক্তিটি নয়। সে তো একটা নেহাৎ গ্রাম্য শিশু। তার দিকে সচক্ষে তাকিয়ে দেখে এ স্বীকারোক্তি করা চলে।

হঠাৎ বালক হয়ে যাওয়া দুটো বয়স্ক লোকের এমন তুচ্ছ তুচ্ছ কিছু নিয়ে মোহচ্ছন্ন হওয়া, আর সত্যিকার রোমাঞ্চিত হওয়া হয়তো চলতো আরও কিছুক্ষণ। হঠাৎ একটা কচি গলার শব্দে চমকে তাকায়।

মোহন ভট্টাচায্যির ছোট একটা মেয়ে ডাকতে এসেছে, আপনারা এবার খাবেন আসুন।

ফ্রকপরা একটা মেয়ে। মেয়ে না নাতনী কে জানে কী। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে তো দেখেছি তখন। কে তারা কে জানে!

সকালে তো ওদের ওখানেই চা-জলখাবার খাওয়া হয়েছে। এবং অনবরত শুনতে হয়েছে 'গরীবের কুঁড়েয় এসে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে।'

শুনতে কী খারাপ যে লাগছিল!

এই হাত কচলানি বিনয় বড় অসহ্য।

অথচ আয়োজন কিছু খারাপ করেনি লোকটা। গোটা ছয়েক করে মিষ্টি দিয়েছে, এবং লুচি বেগুনভাজাও করেছে। লুচিটা অবশ্য আটার এবং বেশ ওজনদার। তবু দেখে মনে হয়েছিল ওটা করতেই বেশ হিমশিম খেয়েছেন মহিলা।

মহিলা মানে মোহন গিন্নী। তিনি অবশ্য মাথার কাপড় একটুও কমাননি। এবং কথাও বলেননি। কথা সবই কর্তা বলেছেন।

খাবেন আসেন।

শব্দটা যেন একটা জগৎ থেকে টেনে নামিয়ে অন্য একটা জগতে আছড়ে এনে ফেলে। মনে পড়ে যায় সকালের সেই পরিস্থিতি। কী অস্বস্তিকর! আবার সেই গাড্ডায় গিয়ে পড়তে হবে।

মুখে বলে উঠল, আরে বাবা! এক্ষুণি খেতে যাব কী? আমাদের তো খিদেই পায়নি।

আহা! খিদাই পায়নি। কত বেলা হয়ে গেছে দেখেন না। হাতেই তো ঘড়ি। এতক্ষণ কী করছেন এখেনে। কোনো মানুষই তো নাই! ভাঙা ইঁট-পাটকেলের সঙ্গে কথা বলছিলেন বুঝি, হি হি হি।

বেশ সপ্রতিভ মেয়ে!

নীলু হেসে বললেন, ঠিক বলেছ! ওরা আমাদের দেখে চিনতে পেরে কথা বলতে শুরু করল কিনা।

মেয়েটা হঠাৎ একটু কাছে সরে এসে ভয়ের দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে আস্তে বলে সত্যি?

কী সত্যি?

ওই যে, কারা যেন কথা বলল বললেন! বাবা তো বলে এ বাড়িতে ভূত আছে!

তাই নাকি? কই আমাদের তো এ কথা বলেননি তোমার বাবা।

কী জানি। পাড়ার সব্বাইকে তো তাই বলে। তবে কেউ বিশ্বাস

করে না। বলে মাঝমধ্যিখানে নারায়ণকে শেকড় গেড়ে বোস করিয়ে রেখেছ, তিনি ভূত ছাড়াতে পারেনি ?····তো—

মেয়েটা একটু ঢোক গিলে বলে আমরাও কেউ বিশ্বাস করি না। দিদি বলে, বাবার ওসব চালাকি। লোককে ভয় পাইয়ে রাখার গঁ্যাড়াকল।

ভাষা শুনে নীলু চমৎকৃত হয়ে বলেন, দিদি কে ?

দিদি আবার কে হবে ? আমার বড়বুন ! দিদি বলে 'ভূত না হাতি ! বাবা ভাবে সবাই ন্যাকা !'

এখন লালু বলেন, তবে আর তুমি ভয় পাচ্ছিলে কেন ?

ওই যে আপনারা বললেন, 'ইঁট-পাটকেলরা কথা বলছিল !'

হা হা হা, সে তো ঠাট্টা করে।

তাই বলেন। বাবাঃ ! ভয় লেগে গেছল ! 'ভূত' বলে কথা ! 'নাই' বললেও ভয় যায় না। তো চলেন।

যাবো তো। আবার সকালের মতো একগাদা খাবার-টাবার দেবে না তো ? বাবাঃ, তখন যা—

মেয়েটা এখন একটু ফিক করে হেসে বলে, এখন আবার 'খাবার' ক্যানো ? এখনতো দুপুর টাইম। বলেন 'একগাদা ভাত'।

নীলু মজা পেয়ে বলেন, সেই তো ! সেই ভাতই যেন না একগাদা- আর শুধুই কী ভাত ? তার সঙ্গে ডাল তরকারিও নিশ্চয় থাকবে।

এ মা। তা থাকবে না ? মানুষকে বুঝি শুধু ভাত ধরে দিতে হয় ? আমরা যে বাড়ির লোক, তাও যদি কিছু না থাকে' মা তেঁতুলের আচার আর নুন কাঁচালঙ্কা দেয়।

'যদি কিছু না থাকে' বলে ফেলেই বোধহয় মেয়েটা নিজেকে সামলে নেয়। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, মা ভীষণ দেরি করে রান্না করে তো। তাই ইস্কুলের বেলায় সবদিন ডাল তরকারি হয়ে ওঠে না।

প্রসঙ্গ পেয়ে লালু বলে ওঠেন, স্কুলে যাও বুঝি ?

যাই। মাইনে দিতে হয় না তো ! তাই যাওয়া হয়। তো মা, রোজই রাগারাগি করে। বলে, মেয়েরা ইস্কুলে গিয়ে আমার মাথা কিনবেন।···· আমি সংসার করবো, কচি ছেলে সামলাবো। একটা মানুষ তো ? চারখানা হাত আছে ? তো দিদি বলে—

বলেই মেয়েটার বোধহয় আবার সামলে নেবার কথা মনে পড়ে, তাই

ছুটন্ত ঘোড়াটাকে রাশ টেনে থামিয়ে বলে, চলেন। চলেন। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

তা যাক। দিদি কী বলে শুনি?

দিদি? ইয়ে-দিদি বলে, 'যাবে না তো কী গোমুখ্যু হয়ে বাড়িতে বসে থাকবে?'

কথার ভঙ্গীতে বোঝা যায়, দিদি হয়তো এটাও বলে, তবে আরো এমন কিছু বলে, যেটা লোকসমাজে বলা সঙ্গত নয়।

বড়জোর বছর আষ্টেক বয়েস হবে মেয়েটার, তবে পরিপক্ক আছে বোঝা যাচ্ছে।

এখন আর এঁরা দুটো 'স্মৃতিভারাক্রান্ত' বয়স্ক বালক নয়। নিজ বয়েসে ফিরে এসেছেন। তবে এই বয়স্ক দুটো ক্রমশই যে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছলেন, দুজনে যে পিঠোপিঠি দুই সহোদর ভাই, তা তেমন মনেও পড়তো না, বরং দুজনেই পরস্পরের ত্রুটি অন্বেষণেই তৎপর হয়ে মাঝখানে দেওয়াল তুলেছিলেন, সেই দেওয়ালটাই যেন হঠাৎ ভেঙে খসে পড়েছে। দুজনে যেন একান্ত কাছাকাছি হয়ে গেছেন।

অবশ্যই এ মানসিকতা সাময়িক।

নিজস্ব জায়গায় ফিরে গেলেই দেখতে পাবেন উভয় পক্ষেরই স্ত্রী-পুত্র সংসার মাঝখানে জমাট হয়ে বসে আছেন যথারীতি। এবং সেই জমাটকে ভেদ করে একজন সহসা বলে উঠতে পারবে না, 'দাদা! দেখেছিস ওখানে এক একটা জিনিস কী অদ্ভুতভাবে একই রকম রয়ে গেছে।'....আর অন্যজন মুগ্ধ বিস্ময়ে বলবেন, 'তোর এতও মনে আছে? আশ্চর্য!'

ফিরে গিয়ে আবার দুটো ভারী ভারিক্কী মানুষ মনে মনে হিসেব কষতে বসবেন এই অভিযানে কার কতটা খরচ হয়ে গেল।

কিন্তু এখন এখানে—

তাই নীলু হেন ব্যক্তি দুর্গাপুরে যিনি 'ঘোষাল সাহেব' তিনি ওই ছোট্ট গাঁইয়া মেয়েটার সঙ্গেই ভাব জমাতে চেষ্টা করেন, তা নাম কী তোমার?...কী বললে? ঝর্ণা? বাঃ খুব ভালো নাম তো? দেখছি কথার ঝর্ণা তো বটেই। পাড়ায় অনেক লোক আছে?

অনেক লোক ? ছাই। কোথায় ? সবাই তো কেবল, শহরে গিয়ে থাকতে গাঁ ছেড়ে চলে যায়। আর যত্তোসব উঠকো লোক এসে জমি জায়গা কিনে গেঁটিয়ে বসে ব্যবসা করে। থাকার মধ্যে যতো থুত্থুড়ে বুড়োবুড়ি, আর নেহাৎ গরীব বিধবা-টিধবা। আর ইয়ে যতোসব ছোটলোকেরা।

ছোটলোক ! ছোটলোক মানে !

মেয়েটা বলেই জিভ কেটেছিল। এখন তাড়াতাড়ি বলে, না মানে, যারা চাষটাষ করে, আনাজপাতি চালানের ব্যবসা করে। তারা আর কী! জানেন দৈনিক গাড়ি গাড়ি জিনিস কলকাতায় চলে যায়। কাঁচা লঙ্কা থেকে সুষনি শাক পর্যন্ত ! ·· বাবা বলে, কলকাতার লোকেরা রাক্ষস ! সব্বস্ব গেরাস করে। যাদের ঘরের জিনিস, তারা খেতে পায় না। আর-ওই তো আপনাদের যে জমিটায়—

আর একবার নিজেকে সামাল দেয় মেয়েটা। তবে কারণটা অন্য। এসে গেছে নিজেদের বাড়ির দরজায়।····

এতটা সময় লাগবার কথা নয়, শুধু খোয়াখন্দ এড়াতে এড়াতেই—

বাড়া ভাতের সামনে এসে লালুর হঠাৎ মনে হলো, যেন টি ভি, সিনেমার একটা দৃশ্য দেখছে। এই সব দৃশ্য এখন ছবিতেই দেখা যায়। দেখা গেল ঘরের মেজেয় গালচের আসন পাতা, আর তার সামনে বৃহৎ কাঁসার থালায় মন্দিরের চুড়োর মতো পর্বতপ্রমাণ ভাত বাড়া আর তার চারপাশে বড় বড় বাটিতে বাটি ভর্তি ভর্তি পঞ্চব্যঞ্জন সপ্তব্যঞ্জন। জলের গ্লাসটাও সেইরকমই ভারী আর পেল্লায়।

সকালে খেতে দেওয়া হয়েছিল দালানে পাতা একটা চৌকিতে বসিয়ে। সামনে দুটো ভাঙাচোরা টুল রেখে। এখন একেবারে সাবেকি ব্যবস্থা। এবং এটি শোবার ঘরের মধ্যে। ঘরটি দেখা যাচ্ছে বাড়ির অন্যান্য সব জায়গার তুলনায় বেশ ছিমছাম। যদিও লম্বা একটা দেয়াল জুড়ে দু-দুটো বৃহৎ চৌকি। তবে তার উপর একটা করে ভবিষ্যযুক্ত সুজনি পাতা আছে।

চৌকির সামনে মাটিতে আহারের আয়োজন।

গালচের আসন দুটো অবশ্য জরাজীর্ণ, আর তেমন লক্ষ্য থাকলে বোঝা যাবে, বাসনগুলো নিত্য ব্যবহৃত না হওয়ার দরুন মাজাঘষা সত্ত্বেও অনুজ্জ্বল। সে যাক, সেটা কেউ দেখেন না এঁরা, দেখেন

অন্নব্যঞ্জনের পরিমাণ। এবং সেটা দেখেই দুই ভাই সমস্বরে হৈ হৈ করে ওঠেন। 'এতো খাওয়া অসম্ভব' বলে হাত গুটিয়ে বসে থেকে, বড়রকম একটা 'তোলাতুলি পর্ব' ঘটান।

মোহন হাঁ হাঁ করে বলেন, 'পাতে পড়ে থাকলেও ক্ষতি নেই। ফেলা যাবে না। আপনারা কিছু আর অব্রাহ্মণ নন।'

কিন্তু এঁরা সে অনুরোধ নস্যাৎ করেন।

না না। তিন ভাগ তুলে নিন।

মোহন ভটচায্যি গিন্নীকে ডেকে তোলাতুলির ব্যবস্থা করে ক্ষুন্নভাব দেখিয়ে বলেন, গরীবের বাড়ি আর আপনাদের যুগ্যি কী জোটাতে পেরেছি? কচু-ঘেঁচুই সার। তবে 'ছেলেপুলেদের মাকে বলেছিলুম আমার তো বিদুরের খুদ কুঁড়ো। তা শহরে ওনারা তো দিশী তরকারি তেমন খেতে পান না, তাই তোমার কচুঘেঁচুই রাঁধো। তবে - নিজের বাড়ির লোক বলে বলছি না, হাতের রান্নাটি—আচ্ছা বলব না। খেয়ে দেখুন।

হঠাৎ সেই ঝর্ণা নামের মেয়েটা আরো তিনটে ভাইবোন সমেত যে থালার কাছাকাছিই বসেছিল, সে হঠাৎ ঝর্ণার তোড়েই হিহি করে হেসে উঠে বলে, খেয়ে দেখবেন।' আহা। এদিকে নিজেই বলেন, 'রান্নার কী ছিরি। মুখে তোলা যায় না। আর বড় যে বলছ, 'কলকাতায় ওনারা এসব খেতে পান না।' অথচ রোজ বলা হয় 'কলকাতার লোক রাক্ষস। কচু ঘেঁচু থোড় মোচা, চালতা, কামরাঙা পর্যন্ত কিছু বাকি রাখে না, সব খায়। গাঁয়ের লোক খেতে পায় না!' সবসময় তোমার দু রকম কথা!

কলির ব্রাহ্মণ। তাই বোধহয় লোকটা সন্তান 'ভস্ম' করে ফেলার দায়ে পড়ে মরে না। তবে কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য শীতলতা।

ঠাণ্ডা আর আলগা গলায় বলে, আহা। সেসব কী আর এঁরা? ওসবের জন্যে আলাদা শ্রেণীর লোক আছে। গিয়ে দেখেছি তো, এঁদের একদম সাহেবি ব্যাপার।

ক্রমেই বোঝা যাচ্ছে লোকটা বেশ ঘোড়েল।

তা নইলে হঠাৎ বলে বসবে কেন? আমার ঘরের এই বড় বড় চৌকি দুটো চিনতে পারছেন দাদা?

চিনতে!! আপনার ঘরের চৌকি!

হুঁ হুঁ, পারলেন না তো, অবিশ্যি পারবার কথাও নয়। আপনাদের তখন কী বা বয়েস। আমিও তো তাই। আমার বয়েস বোধহয় এই ছোড়দার মতো হবে। তো তখনই বাবার সঙ্গে আপনাদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে পালিশ চকচকে বাঘমুখো পায়া, এই চৌকিদের দেখে হাঁ হয়ে যেতাম। সব দেখেই হাঁ হতাম। আপনার পিতৃদেব ঈশ্বর ত্রিলোকেশ্বর ঘোষাল। আহা! কী চেহারা ছিল। যেন রাজার মতো। বোধহয় আমার বাবার মতোই বয়েস। তো হাসবেন না—দেখে মনে হতো আমার বাবা কী বিচ্ছিরি কালো রোগা। আর ওদের বাবা কী সুন্দর। সে যাক। ক দিনই বা ছিলেন তিনি। বাবা বলতেন, 'বেশি ভালো জনেরা হচ্ছে স্বর্গভ্রষ্ট। তাঁরা বেশিদিন পৃথিবীতে থাকেন না।' সে যাক, আপনাদের বাড়িতে এইসব বাহারী চৌকি, ইয়া বড় আলমারি, আলনা আরশি কত কী! দেখে চোখ ট্যারা হয়ে যেতো। তো সবই তো কর্পূরের মতো উবে গেল। তবে আমার বাবা সাধন ভট্‌চায্যি ছিলেন খাঁটি মানুষ। মরে যাওয়া যজমানের পড়ে থাকা সংসারটি বুক দিয়ে আগলে থেকেছেন। আপনার পিতামহ নাকি মৃত্যুকালে বাবাকে ডেকে বলেছিলেন, 'সাধন! নারায়ণ রইলেন!' ব্যাস্‌। ওই পর্যন্ত। তো বাবাও সেই অবধি রাগ করছেন না তো দাদারা? মুখ্যু মানুষ কথার ভনিতে তো জানি না।

নীলু মনে মনে বললেন, জানো না আবার! খুবই জানো। তোমার ভনিতা দেখে আমি তো হাঁ হয়ে যাচ্ছি।

আর লালু ব্যস্ত হয়ে বললেন, না না রাগ কেন। আমাদের বাড়ির ব্যাপার আমরাই জানি না। বলছেন তাই

জানবেন কোথা থেকে? আপনার ওই যে মাতুলটি ছিলেন, মনে কিছু করবেন না দাদা, তিনি হচ্ছেন এক নম্বরের দায়িত্বজ্ঞানহীন। বিধবা বোনটাকে আর অপোগণ্ড ভাগনা দুটোকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন, বেশ করলেন। উচিত কর্তব্য করলেন। কিন্তু জীবনে যে তাদেরকে আর এ মুখো হতে দিলেন না, সেটা কি উচিত হয়েছিল? আমার বাবা ওই বলে কত আক্ষেপ করতেন। তো তবু বাবা সব বুক দিয়ে আগলাতেন। 'যাদের জিনিস তারা বড় হয়ে কোনোদিন এসে নেবে' বলে। কিন্তু আপনারাও তো, আসলে চিনলেনই না তো পিতৃপুরুষের ভিটে-গাঁকে। তো বেওয়ারিশ জিনিসকে আর কতকাল শ্যাল শকুনের মুখ থেকে রক্ষা করা যায় বলুন? বাবা গেলেন, আর সেবারের বর্ষায়

আপনাদের রান্নাবাড়ি গোয়ালবাড়ির দিকটাও পড়ে গেল। ব্যাস বাড়ি একদম 'হাট দরোজা।' কোনদিকে চাবি দেওয়া হবে? সব লুটপাট হতে থাকলো। তো বৃহৎ বলে এই চৌকি দুটো নিয়ে যেতে পারেনি। আর সব হাওয়া। দেখেশুনে বড় দাগা লাগলো, তাই এই চৌকি দুটোকে টেনে নিয়ে এসে নিজের ঘরে পুরে রেখেছি। যদি নিয়ে যেতে চান অনায়াসে নিয়ে যেতে পারেন।

নিয়ে যেতে চাইব? ওই প্রকাণ্ড চৌকি দুটো?

নীলু হেসে ওঠেন।

লালুও যোগ দেন।

মোহন বলেন, না নেন সে আলাদা কথা। তবে আমি ও দুটোকে অপরের গচ্ছিত জিনিস বলেই ধরে নিয়ে—মনে ঠিক দিয়ে রেখেছি। এ বাজারে দাম তো কম নয়। তো যেটুকু পেরেছি সামলেছি। বাকি আরো কত কী ছিল? সে আর সামলাতে পারলাম কই?

বাবা!

'বিনা মেঘে বজ্রপাত' বলে একটা বাজার চলতি কথা আছে না? হঠাৎ সেই কথাটা ঘটে গেল। আর এই অপরিসর একটু জায়গার মধ্যে। 'বজ্র'টি অকস্মাৎ কোনখান থেকে ছিটকে এসে পড়ল, একটি তরুণী রূপে।

সস্তামার্কা একখানা ডুরে শাড়ি আঁটসাঁট করে পরা, চুলগুলো 'তাল' মেরে জড়ানো! এসেই বলে উঠল, উঃ। অসহ্য! আর কত গপ্পো বানাবে বাবা। দুটি নেহাৎ ভদ্রলোককে হাতে পেয়ে এন্তার গুল ঝেড়ে যাচ্ছ দেখছি। এবার থামবে?

লালু আর নীলু দুজনেই চমকিত হন।

কে এ? কে? কেন? তো বাবা বলল যখন মোহনকে। কিন্তু ওই কেলে হাড়গিলে লোকটার এই মশালের মতো মেয়ে? এই তাহলে ওই ঝর্ণার সেই দিদি। যার কথা বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল মেয়েটা।

নীলু তাকিয়ে দেখেন।

না, এখন মেয়েটাকে নয়, দেখেন মোহন ভটচায্যিকে। নাঃ, মুখের কাটুনিতে পিতা-পুত্রীর বেশ একটি সাদৃশ্য আছে বটে। তবে জ্বলন্ত আগুনের সঙ্গে পোড়া কয়লার যেটুকু সাদৃশ্য থাকে।

তবে মেয়েরা যে বাপের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীলা নয় তা দেখা যাচ্ছে।

মোহন ভয়ানক রকম চমকে উঠে তাড়াতাড়ি বলেন, তুই আবার কী করতে এখানে ? তোর এখানে কী কাজ ? এলি কখন ? তোর সাধের পাঠশালা এক্ষুনি বন্ধ হয়ে গেল ?

রোজই এ সময় যায় বাবা। তবে আজ না গেলেই বোধহয় ভালো হতো তাই না ? তা হলে আরো কিছুক্ষণ চালাতে পারতে !

বাপ এই অতর্কিত আক্রমণে বোধকরি একটু হতভম্ব হয়ে যায়। তবে সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে বলে, তা চালাতামই তো। তোদের এখানে দুটো কথা কইবার মতো লোক আছে ? মানুষের মতন মানুষ দুজনকে পেয়েছি, দুটো সুখ দুঃখের কথা কয়ে বাঁচছি। এই যে দেখুন না, দাদা এই এক মেয়ে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছেন। নিজে চেষ্টা যত্ন করে হায়ার সেকেণ্ডারিটা পাশ করেছিস বাবা, না হয় একটা চাকরিবাকরিই কর, বাপ ব্যাটা যখন বে দিয়ে উঠতে পারছে না। তা নয়, যত রাজ্যের উনচুটেদের ছেলেমেয়েকে ধরে এনে এনে পাঠশালা খুলে তাদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন মেয়ে। কোনো মানে হয় ? অ্যা বলুন ? তো যা বাবা, তেতে পুড়ে এসেছিস, হাত মুখ ধুগে যা। দাদা, আপনারা এখনও হাত গুটিয়ে বসে কেন ? এবার খান। তিন ভাগ তো তুলেই দিলেন।

মেয়েটা হেসে উঠে বলে, না দিয়ে উপায়। এখানের মতো এক পাহাড় ভাত তরকারি খাওয়ার অভ্যাস শহরের লোকের থাকে না বাবা ! তো খান আপনারা। বাবা ততক্ষণ আপনাদের কব্জায় পেয়ে আরো কিছু গুলতাপ্পি চালিয়ে যেতে পারে। তবে আমি তো বলি এত না বললেও চলতো ! বেওয়ারিশ মাল পড়ে আছে যুগ যুগ ধরে। সুবিধে পেলে কে আবার না হাতায় ? দোষ তো আপনাদেরই !

হাতায় ! হাতায় মানে ? লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, কী বলছিস কী ? কী আমি হাতিয়েছি রে ? বাবা চলে যেতে পাড়ায় লোক ছোঁক ছোঁক করতে শুরু করেছে দেখে ওনাদের জিনিসপত্তর যত্ন করে ঘরে এনে রেখেছি। তাই এই চৌকি দুটোর কথাই তো বলছিলাম। বলি এ জিনিস আপনাদেরই !

মেয়ে হেসে উঠে বলে, তা একটু সাফাই গেয়ে তো রাখতেই হবে বাবা। জানোই তো যতই তুমি এনাদের আগলে রাখার চেষ্টা করো, পাড়ার লোক এনাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করে কী আর ছাড়বে ? আর

করতে পারলেই তো হাটে হাঁড়ি।

এবার মোহন ভটচায্যি উষ্ণ হয় হাটে হাঁড়ি মানে? অ্যাঁ! হাটে হাঁড়ি মানে কী?

মানেটা কী আর তুমি না বুঝছো বাবা? কথায় বলে পড়শী। তারা বিপদে আপদে এগিয়ে না আসতে পারে না আসুক, ঘরে বসে ঠিকই তোমার সব খবর রেখে চলেছে। তো এনাদের একবার পেলে কী আর—

মোহন ক্রুদ্ধ গলায় বলে, পেলে কী করবে শুনি? আমায় জেলে দেবে না ফাঁসি দেবে? এনাদের কী সোনাদানা হাতিয়েছি আমি? কই দেখাক তো এসে এই ডেয়ো-ঢাকনা দুটো ছাড়া আর কোথায় কী আছে?

মেয়েটা কিন্তু টসকায় না, হেসে হেসেই বলে, 'সোনাদানার' কথা তো আমার জানার কথা নয় বাবা, সবই তো আমার পড়শীর মুখে শোনা কথা। তা শোনা কথায় আমি কান দিই না। ওবাড়ির ওই ভূতুড়ি বুড়ি বলে বটে—সেকালের কর্তারা নাকি নিজের শোবার খাট চৌকির মধ্যে অন্তরালে খোপ কেটে 'লকার' বানিয়ে তার মধ্যে সোনাদানা রেখে দিতো, যাতে চোর ডাকাতে তেনাকে খুন না করে আর সে জিনিস নিতে পারতো না।...সে যাক গে, বুড়ির কথায় কে কান দেয়? বুড়ি তো বলে ঘোষালবাড়ীর সমোগ্‌গুরো সংসারের জিনিস তোদের ঘরে। শিলনোড়া জাঁতা কুলো বঁটি কাটারি থেকে বাসনের পর্যন্ত সব।

সহসা আসনে বসা লোক দুটোর অজ্ঞাতসারেই চোখাচোখি হয়, আর দুজনেই আবার হঠাৎ বালকত্ব প্রাপ্ত হয়ে কোথা থেকে শুনতে পায় তাদের মায়ের কণ্ঠস্বর, কী আশ্চয্যি দাদা। কেবলই তুমি এই সব পয়সা খরচ করে কিনে আনছো? অথচ একটা পুরো সংসারের জিনিস পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। একবার গিয়ে নিয়ে আসতে পারলেই—'

'ফ্ল্যাশব্যাক' এর ওই ক্ষীণ অনুযোগের ধ্বনির পরক্ষণেই আর একটা জোরালো ধ্বনি শোনা যায়, হা হা হা! 'একবার গিয়ে' সব নিয়ে আসা কী সোজা! তার থেকে অনেক সোজা বাজার থেকে কিনে আনা।

'মা'র মনটা নিয়ে ভাবার অভ্যাস ছিল না কোনোদিন ছেলেদের, হঠাৎই যেন আজ সেটা এসে হাজির হয়েছে। তাই দু'জনেরই মনে হলো হয়তো শুধুই ভাইয়ের পয়সা খরচের জন্যই নয়, 'সংসারের' সেই 'জিনিস'গুলোর প্রতিই ছিল মার একান্ত মমতা।

হয়তো আবার সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে, ব্যবহার করতে খুব একটা ইচ্ছে হতো মার। তাই কেবলই বলতেন, 'কত কত ভারী ভারী বৃহৎ বৃহৎ জিনিস পড়ে পড়ে কাঁদছে আর এখানে টুকটাক কিনে কিনে—'

'কাঁদতো' কী শুধু জিনিসগুলোই ?

কিন্তু সেই 'ফ্ল্যাশব্যাক'-এর ছবি তো মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। শুনতে পান ওই বাপকে অপদস্থ করে 'মজা দেখা' মেয়েটা বলছে, কাঠ-কাঠরার আসবাব-পত্তরের কথা ধরি না বাবা। পড়ে থেকে থেকে শেষপর্যন্ত তো 'ঘুন' এর পেটে যেতো। এ না হয় 'বিক্রমপুরে' পাঠানোর দৌলতে মানুষের পেটে গেছে—

হঠাৎ ফেটে পড়ে ভট্চায্, বলে, কী ? কী বললি হারামজাদি ? ঘরশত্রু বিভীষণ ! আমি সব 'বিক্রমপুরে' পাঠিয়েছি ?

লোকে তো তো তাই বলে গো বাবা। নেহাৎ না কী ওই বীরভদ্র সিন্দুকটার মধ্যে 'ডাইনির বাসা' তাই ওটাকে আর—

ডাইনির বাসা !

সেই কথাটা তাহলে বাজারেও চালু ছিল ? এও বলছে সে কথা ?

লালু এবং নীলু ওই অগ্নিশিখার মতো মেয়েটার দিকে যেন যাকে বলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। ভদ্রতার দায়ে যে মোহন ভট্চাষ্যি নামের লোকটার স্বপক্ষে কিছু বলা উচিত, তা মনে পড়ে না। আর সত্যি বলতে মোহনের মুখের দিকে তো তাকাচ্ছেনও না ! কিন্তু তার ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ গর্জনে চকিত হলেন। শুনতে পেলেন, ওঃ। এই এক শত্তুর পুষছি। 'বে' দিয়ে বিদেয় করতেও তো পারলাম না। মেয়ে হয়ে পাঁচ-জনের সামনে এত হ্যানস্থা ? হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, আমি তোর সৎ বাপ ?

বলে হঠাৎ বোধহয় মেয়েটার গালের বদলে চটাস চটাস করে নিজের কপালটা চাপড়ায়।

এখন মেয়েটার তীব্র তীক্ষ্ম মূর্তিটা হঠাৎ বদলে যায়।

হঠাৎ কেমন করুণ করুণ হয়ে যায়।

'সৎ বাপ' শব্দটা অবশ্য ক্রুদ্ধ মোহন ভট্চায্ 'সৎমা' শব্দটার বিপরীতার্থক হিসেবেই প্রয়োগ করেছে মেয়ের হঠাৎ বিরোধী পক্ষের ভূমিকা দেখে।

তবে ঠিক 'হঠাৎই' কী বলা যায়? ও মেয়ে একটু বড় হয়ে ওঠা থেকেই তো মা-বাপ উভয়েরই বিরোধী পক্ষ। মাও যে বাবার লোভ দুর্নীতি আর ইল্লুতেপনার সমর্থক, এতেই মেয়ের মাথা জ্বলে যায়।

মাথা জ্বলে মা-বাপেরও মেয়ের ঔদ্ধত্যে। ছেলে হলে হয়তো কখনো রাগের মাথায় বলে ওঠা যায়, 'যা বেরো। দূর হয়ে যা আমার বাড়ি থেকে!' মেয়েকে বলা যাবে সে কথা? সেসব বাল্যেও না, যৌবনে তো নয়ই। মেয়ে সন্তানের কাছে মা-বাপের হাত-পা বাঁধা।

তাই সর্বদাই বাপ মেয়ের চোটপাটে মনে মনে ফোঁসে, আর মা গলা চিরে চেঁচায়, 'মরছেন। রূপের গরবে মরছেন। মেয়ের রূপ নিয়ে ধুয়ে জল খাব আমি। বলি রূপের জোরে বিনি পয়সায় বিকোতে পারলি আজ পর্যন্ত? সেখানে তো কালা-ধলার একই দাম!'

কিন্তু এসব তো লোকসমাজে শুনিয়ে নয়। ভটচায্যি বাড়িটা তো বলতে গেলে গাছপালা বাঁশঝাড় আর জঙ্গুলে পরিবেশের মধ্যে, প্রায় লোকচক্ষুর অগোচরে। চেঁচানিটা বাতাস কেটে আকাশে ওঠে। পড়শীদের কানে তেমন জোরালোভাবে পেঁছায় না। তা হলে হবে কী? ধিঙ্গী অবতার মেয়ে যে, 'বসে থেকে কী হবে বেগার খাটি' বলে পাঠশালা খুলে কতকগুলো হাড়হাভাতে ছোঁড়াছুঁড়ি জুটিয়ে লেখাপড়া শেখাতে বসেছেন, সেই সূত্রেই পাড়ামজানি! 'কিছু না হোক তোদের অক্ষরটাও পরিচয় হোক রে।' মায়া উথলে ওঠে। কেন? কেন রে লক্ষ্মীছাড়ি। ওদের অক্ষর পরিচয় করিয়ে তোর কোন স্বর্গে বাতি জ্বলবে?

তো সেসবই তো অন্তরটিপুনির মধ্যে চলে। তাই বলে শয়তান মেয়ে এই সদরে এদের সামনে বাপকে এই হ্যানস্থাটা করবে?

মেয়েটা কিন্তু ওই রুষ্ট ক্ষুব্ধ প্রশ্নে হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা মেরে গেল। শান্ত আর প্রায় করুণ স্বরে বলল, 'সৎবাপ' নয় বলেই তো আমার এত কষ্ট বাবা। 'অসৎ বাপের' মেয়ে হয়ে লোকের কাছে মুখ দেখানোর যে কী জ্বালা কী বুঝবে? নিজের তো এমন দুর্ভাগ্য হয়নি।

মেয়ে যদি আরো অগ্নিমূর্তি হতো, তাহলে হয়তো জোঁকের মুখে নুন পড়তো। হয়তো মিইয়ে যেতো লোকটা। কিন্তু হঠাৎ মেয়েরই মিয়ানো ভাব দেখে বুকে বল আসে তার। ব্যঙ্গ, তিক্ত গলায় বীরবিক্রমে বলে ওঠে, ওঃ। অসৎ! তো বাপব্যাটা 'অসৎ'টা কিসে শুনি? অ্যা? কিসে? মোদো মাতাল, গেঁজেল স্বভাব খারাপ? অ্যাঁ? বুকে হাত

দিয়ে বল !

মেয়ে তেমনি করুণভাবে বলে, মাতাল গেঁজেল কিনা তুমিই জানো বাবা। আর তোমার হিসেবে 'স্বভাব খারাপ' কাকে বলে সেও তুমিই জানো। তবে আমি তো মনে করি না অপরের সম্পত্তি চুপিচুপি বেনামিতে কেনা বেচা করে আর দালালি খেয়ে খেয়ে প্রায় ফর্সা করে এনে, শেষটুকুর টোপ গিলিয়ে হঠাৎ তার মালিকদের 'তোমাদের যথা-সর্বস্ব ফেরৎ নাও' বলে ডেকে এনে নাটক করতে বসা মহৎ স্বভাবের লক্ষণ ! তা যা চালাচ্ছিলে চালাচ্ছিলে, বেশ করছিলে। এঁরা তো টেরও পাচ্ছিলেন না। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মাথাব্যথাও ছিল না এঁদের। হঠাৎ এই ধাষ্টমোটা করতে বসলে কেন বাবা ? তোমাদের তো লজ্জার বালাই নেই, আমার যে লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

বলে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তিনটে লোককে কাঠ করে দিয়ে। একটু পরে কোনো একসময় নীরবে দু এক গ্রাস ভাত মুখে তুলে জল খেয়ে উঠে পড়েন দু ভাই। অথচ তাঁদের পরম হিতৈষী কুলপুরোহিত মোহন ভট্চায্, 'এ কী খাওয়া হলো ?' বলে হাঁ হাঁ করতে সাহস করল না।

পাতা ছক্টা উল্টে যায়। সাজানো ঘুঁটিগুলো ছড়িয়ে পড়ে। কারণ হঠাৎই নীলুর মনে পড়ে যায়, মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সে অফিসে যে লম্বা ছুটিটা নিয়েছিল সেটা শেষ হতে আর মাত্র দুটো দিন বাকি আছে। কাজেই আজই চলে না গেলে -

আর লালুর ? তাঁরও ক'দিনের অনিয়মে শরীরটা তেমন ঠিক নেই। অতএব একা এখানে আরো দুদিন থেকে যাওয়ার সাহস করছেন না।

আগামীকাল জমির খদ্দের আসার কথা।

কী আর হবে ? আবার আসা যাবে সুবিধে মতো।

মিইয়ে যাওয়া মোহন জোর গলায় বলে উঠতে পারে না, 'খদ্দের লক্ষ্মী' তাকে একবার হাতছাড়া করলে সহজে আর হাতের কাছে নাও আসতে পারে।

বলবে কী, সর্বনাশী মেয়ে যেন তার বাপটাকে ফোঁপরা করে দিয়ে গেল।

ওঁরা চলে গেলে মোহন শুধু তার সহধর্মিণীকে ডাক দিয়ে

ধিক্কারের গলায় প্রশ্ন করে উঠল, এই মেয়েকে কেন সে আঁতুড় ঘরেই নুন দিয়ে মেরে ফেলেনি ?

তবে সে প্রশ্নের উত্তরের দিকে না গিয়ে ওই সর্বনাশী মেয়ের মা-টি আরো একটু পিছিয়ে গিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করল, তুমিই বা অমন হাড় বজ্জাত মেয়েকে জন্মটা দিয়েছিলে কেন ?

নাঃ, ওরা দুজনের কেউই ভাবেনি, পেটের মেয়ে তা সে যত পাজীই হোক এইভাবে বাপকে লোকসমাজে অপদস্থ করে বসবার তালে ছিল। ছিলই তো। মনে মনে ভেঁজে না রেখে কী আর—

'এ ধাষ্টমোটা করতে বসলে কেন বাবা ?' ওরে আমার বিদুষী লীলাবতী। কেন বসতে হলো তা বুঝবে তুমি ? ডোবা-পুকুর, ফালতু জমি, বাঁশঝাড়, দূরের দূরের আম-কাঁঠালের বাগান, সুপুরি গাছটা, নারকেল গাছটা সহজে তলে তলে এদিক ওদিক করতে পারা গেলেও 'ভিটে বাড়ি' নামের জিনিসটা এদিক ওদিক করা তেমন সহজ নয়। এখনো ওই পোড়ো ভিটেখানাকে পাড়ার লোকে 'ঘোষালদের ভিটে' বলেই উল্লেখ করে। তাছাড়া আরো মোক্ষম কথা, এই ভিটেটা আর তার সংলগ্ন জমি-বাগান-পুকুর-টুকুর সম্পর্কে যার সঙ্গে কথা হয়েছে সে একটি ঝুনো ব্যবসাদার, কাজেই ভবিষ্যতে যাতে গোলমেলে অবস্থা না ঘটে, তাই একেবারে আইন মোতাবেক সবকিছু করতে চায়। আসল মালিকদের ডেকে আনো, আসল দলিলপত্র বার করো, ব্যস, ঠিক আছে।

সেই কারণেই এই ধাষ্টমো।

মোহনেরও কপাল, কথাবার্তা অনেকটাই এগিয়ে, ভেবেছিল একবার কলকাতায় গিয়ে মা ঠাকরুণকে ভুজং ভাজুং দিয়ে একটা যাহোক ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবে। কিন্তু—অভাগার কপাল. ঠিক এই মওকায় তিনি মরে বসলেন। মরবার আর সময় পেলেন না।

একেই বলে অদৃষ্টের ফের।

মোটা দালালির আশা ছিল। আবার এখন ভাবতে বসতে হবে, কীভাবে আবার অবস্থা আয়ত্তে আনা যায়।

মেয়েকে তো চুলের মুঠি ধরে দেয়ালে মাথা ঠুকে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। ঠাশ ঠাশ করে গালে চড় কষিয়ে গাল ফাটিয়ে দিতে, কিছু সাহস হয় না। সবদিকে হাত পা বাঁধা। যে দিনকাল। তাতে মেয়ে হয়তো এক্ষুণি একটা 'সুইসাইড নোট' লিখে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে বসবে

বা গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই কাঠি জেবলে দেবে। তখন?

অতএব নিজের গালেই চড় কষায় মোহন ঠাশ ঠাশ করে ঘোষাল ভ্রাতাদের স্টেশনের পথে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে এসে।

ট্রেনে চেপে লালু আবার কমবয়সে ফিরে যান। ভিড়ের মধ্যেও ফিসফিস করে বলে ওঠেন, নীলু। ভাগ্যিস। খুব প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা গেছে। চট করে ভালো বুদ্ধিটা বের করে ফেলেছিলি।

নীলু বললেন, করব না? ওদের ওখানে থেকে যেতে হলে ওই বাঘ-মুখো পায়া চৌকিতেই তো শুতে হতো? বাবা। তাকিয়ে দেখে মনে হচ্ছিল মুখগুলো যেন হাঁ করে থাবা বসাতে আসছে।

এখন মনে পড়ছে রে নীলু, ছেলেবেলায় আমি ওই পায়াগুলো দেখে খুব ভয় পেতাম। মা তাই আমাদের ঘরের চৌকির পায়াগুলোয় বোধহয় খানিকটা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো জড়িয়ে বেঁধে রেখে দিতো।

ঠিক বলেছো দাদা। মনে হচ্ছে কী যেন জড়ানো থাকত। তবে দাদুর ঘরে ঢুকলেই তো গলা শুকিয়ে আসতো। ওই বাঘমুখ। তার ওপর আবার ডাইনির সিন্দুক।

সিন্দুকটায় কী আছে দেখে আসা হলো না রে।

দেখে আসা অত সহজ না কী? চাবি কোথায় তার ঠিক নেই। শেষ পর্যন্ত হয়তো ভেঙে দেখতে হবে। কিন্তু কিছু একটা রহস্য আছে নিশ্চয়। নাহলে মোহনভটচায্যিটাই করেনি কেন? দেখলি তো অবস্থা, বহুকাল হাত পড়েনি। দেখা যাক বাড়ি গিয়ে পরামর্শ করে।

ততক্ষণে হাপিস হয়ে যাবে কিনা কে জানে?

নাঃ, তা হবে না বোধহয়? এতদিন যখন হয়নি। তাছাড়া—ওই এক তেজী মেয়ে রয়েছে ঘরে। দারুণ মেয়ে। ওই বাপের ওই মেয়ে। ভাবা যায় না। ভটচায্যির মুখের চেহারাটা দেখে কিন্তু একটু মায়াও হচ্ছিল। কিন্তু এসব গল্প কার কাছে গিয়ে করবো রে নীলু?

সেই তো? দুটো ভারি নিঃশ্বাস একসঙ্গে পড়ে।

দাদা।

বল।

আমাদের এই 'ডাক নাম'গুলো কে রেখেছিল? জানো? মায়ের মুখে তো শুনেছি ওই বুড়োই রেখেছিল।

ওই বুড়ো। ধ্যেৎ। সেই খেঁকি বুড়ো এমন আদুরে গোপাল নাম রেখেছিল নাতিদের?

তাই তো বলেছিল মা। আবার নাকি নাম করবার সময় পুরো আস্ত নামটা ছাড়া বলতো না। বলতো 'লালকমল' 'নীলকমল'।

আশ্চর্য। অঙ্কে মিলছে না।

কিন্তু এ সংসারে কটা ব্যাপারেই বা অঙ্ক মেলে? 'পঞ্চভূতে' গড়া মানুষ নামের এই প্রাণীটার মধ্যে যে পাঁচমিশেলি কাণ্ড। পাঁচভূতের কারখানা।

পাঁচ খুপরি খোপ। পাঁচ কুঠুরি ঘর। পাথরের দেয়াল তোলা। ঘরে ঘরে চলাচলের দরজার ব্যবস্থা নেই। বাতাস চলাচলের না, এ ঘরের বাতাস ও ঘরে পেঁছায় না। যখন যে ঘরে এসে ঢুকে পড়ছো তখন সে ঘরের নক্সায় আছো। সে ঘরের বাতাসে পাক খাচ্ছো।

তাই এখন আর ঘোষালসাহেবের পক্ষে হঠাৎ 'দাদা তুই করে ডেকে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। এখন কথার সুর আলাদা। অন্য এক ঘরের সুর।

বাড়িসুদ্ধু সবাই তো তেড়ে উঠে বলছে মামলা ঠুকে দিতে। তো আমার তো আর চাকরি-বাকরি ছেড়ে কোর্ট-ঘর করতে বসলে চলবে না। তোমারই বরং সেটা সম্ভব। এখন দাসত্ব বন্ধন ঘুচেছে। ঝাড়া হাত পা মানুষ, দরকার হলে ওখানে গিয়ে দু'দশদিন থাকতেও পারবে। আর আমার মতে সেটাই উচিত। ওই একটা মুখ্যু গাঁইয়া লোক এযাবৎ আমাদের বোকা পেয়ে ঠকিয়ে খেয়ে আসছে আর আমরা ভ্যাবলা হয়ে—কোনো মানে হয় না। মা থাকতে থাকতেই একবার যাওয়া উচিত ছিল। তাহলে হয়তো লোকটা এত বেপরোয়াভাবে—

উচিত ছিল। তো তাই যদি ছিল তো তুই বা নিয়ে যাসনি কেন? নবীনগঞ্জ তোর দুর্গাপুর থেকে তো বরং আরো কাছে।

আমি! আমার উচিত ছিল! চমৎকার! মা বরাবর এখানেই থেকেছেন, এখান থেকে সুবিধে হলো না আর—

তা এখন যে বলছিস আমাকে সেখানে গিয়ে দু পাঁচ দিন থাকতে। কোথায় থাকতে যাব শুনি? ওই ভট্চায বাড়িতেই?

অ্যাবসার্ড কথা বলো না দাদা। কেন, বাড়ির দুখানা ঘর তো যথেষ্ট ভালো রয়েছে। জানালা দরজাও আস্ত আছে। দালানটাও খুব খারাপ নেই। দরজাটাই যা একটু তলা ক্ষয়ে গেছে। তবু কড়ায় তো তালা চাবি লাগানো ছিল। একটু সারিয়ে নিতে পারলেই অনায়াসেই দু পাঁচদিন বাস করা যায়।

দাদা ক্ষুব্ধ গলায় বলে, ওঃ। খুব একখানা সার্কুলার জারি করা হলো। বলি থাকা তো যায়, তো কী খেয়ে? হরিমটর? না কি স্বপাক হবিষ্যি? অ্যাঁ?

ছোট ভাই তথাপি নির্লিপ্ত গলায় বলে, তা ইচ্ছে করলে বৌদিকেও নিয়ে যেতে পারো। ওঁরই বা এখানে এমন কি জরুরি কাজ আছে?

কী? তোর বৌদিকে নিয়ে? সে একবেলা ওখানে থাকতে পারবে? জানিস না, ওর নিজস্ব বাথরুমটা আর কেউ একবার ব্যবহার করলেই কী অসন্তোষ করে। দশ বার ধুতে বসে। সেখানে গিয়ে—

তাহলে নাচার।

নীলু আরো নির্লিপ্ত গলায় বলে, প্রয়োজনের কিছুটা অ্যাডজাস্ট করে নিতেই হয় দাদা। না পারলে বলার কিছু নেই। নিজস্ব বাথরুম! ওটাও একধরনের শুচিবাই দাদা।

বলে নীলু এ কথা। অনায়াসেই বলে। কারণ এখন যে এই একটা অন্য ঘরে চলে এসেছে। যে ঘরটায় অনেকদিন যাবৎ নিজেকে বসিয়ে রেখেছিল। এ ঘরে এমন একখানা জানলা নেই যে হাওয়ায় খুলে পড়ে ছাপ্পান্ন বছরের লোকটাকে ছবছরের ঘরে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে!

এখন আপাতত এটাই স্বাভাবিক ঘর। যে ঘরের কর্ত্রী শ্যামলী ঘোষাল। যাঁর ভুরুর ওঠানামায় ঘোষাল সাহেবের ওঠানামা নিয়ন্ত্রিত।

শ্যামলী ঘোষালের পৃষ্ঠপোষক তাঁর বর্তমান বি. এ. পড়ুয়া বড় ছেলে চন্দনেশ্বর আর এখনো স্কুল ছাত্রী কন্যা বিধি। একটু বাপ ন্যাওটা বটে তবে মাকে যমের মতো ভয় করে। অথচ মায়ের কাছে তার ছেলেটির অগাধ প্রশ্রয়। মায়ে ছেলে বেশ আঁতাত।

লালুর সংসারটা অবশ্য আর একটু এগিয়ে গেছে। বোকা লালুর তিন তিনটে ছেলেমেয়ে।

মেয়ে দুটোর তো আগেই বিয়ে হয়ে গেছে, সম্প্রতি ছেলে

পরমেশ্বরেরও বিয়ে হয়ে গেছে। দৃশ্যতঃ অবশ্য প্রচারিত - 'আমার নাত বৌয়ের মুখ দেখাবি না লালু?' বলে স্বর্ণচাঁপার নাকি আকুলতার ফলশ্রুতি সাত সকালে ছেলের বিয়ে দেওয়া। তবে নেপথ্য দৃশ্যে ছিল নাতিরই ঠাকুমাকে প্রবল প্ররোচনা দান। 'কি দিদা? নাত বৌ না দেখেই টেঁশে যেতে চাও নাকি? মাঝে মাঝে যা খেল দেখাও! তো হাতে একখানা পাত্রী মজুত রয়েছে চাও তো বল? কেমন পাত্রী? একেবারে সর্বোত্তমা হে। নামে গুণে!'

স্বর্ণচাঁপার আবেদনটি নিস্ফল হয়নি। অবশ্য বাড়ির মা এই গোপন বৈঠকের খবরটা পাননি বলেই। হলে কী হতো বলা যায় না। মেয়ে সর্বোত্তমা হলেও, যদি টের পেয়ে যেতেন এর মধ্যে শাশুড়ীর হাত রয়েছে তা হলে অবিলম্বে নাকচ করে বসতেন হয়তো। চিরদিনই ওই মহিলাটিকে অলকা প্রতিপক্ষ হিসেবেই দেখে এসেছেন।

কেন?

কে জানে কেন?

শ্যামলী ঠিক ওরকম প্রতিপক্ষের ভূমিকায় থাকেননি কোনোদিন। বরং ভাবটা যেন সহানুভূতির ভাব। যেন আহা বেচারি মহিলা 'একটা জাঁদরেল বড়বাবুর আণ্ডারে' পড়ে আছে। সেই জ্বালার ওপর একটু মলম লাগাই। তাছাড়া তিনি যে ছোটছেলের সংসারে গিয়ে থাকতে রাজী হতেন না সেটাও একটা কারণ। প্রায় কৃতজ্ঞতার মতোই। অতএব ছুটি-ছাটাতে দুদিন ভাসুরের বাড়িতে এসে শাশুড়ীকে যতটা সম্ভব দ্যাখভাল করতে চেষ্টা করতেন। জামাটা, কাপড়টা, চাদরটা, গামছাটা অথবা ওষুধটা আছে কিনা তার খোঁজ নিতেন; এবং তার সুব্যবস্থাও করে যেতেন।

দু'দিন চারদিনই। পুরো ছুটির বাকি দিনগুলো তো বাপের বাড়িতেই কেটেছে। এবং সেটাই তো ন্যায্য। তাঁর মা হাঁ করে বসে নেই মেয়ের আসার অপেক্ষায়?

এবারেই 'কারে' পড়ে থাকতে হলো অনেকদিন।

শাশুড়ীর 'যায় যায় অবস্থা' অতঃপর যাত্রা। এবং তারপর হিন্দুয়ানীর নানা অনুসঙ্গের ফেরে পড়ে নিরুপায় বন্ধন যন্ত্রণা। নিয়ম-ভঙ্গের যজ্ঞির পরদিনের বাসি মাছ মিষ্টিগুলোর সদ্গতি হওয়ামাত্রই শ্যামলী ঘোষাল ছেলেমেয়ে নিয়ে রওনা দিয়েছিলেন শ্রীরামপুরে। তার

পরদিন তো ঘোষাল ভ্রাতৃদ্বয়ের নবীনগঞ্জ অভিযান।

তো দুটো দিন তো পার করার কথা! রাতারাতিই ফিরে আসার কারণ?

কারণ শুনে স্বর্ণচাঁপার চির প্রতিপক্ষ অলকা ঘোষাল তো মার-মূর্তি। অতঃপর শ্যামলী ঘোষালও ফিরে এসে, আশ্চর্য ম্যাজিকে তার চির প্রতিপক্ষ অলকা ঘোষালের সঙ্গে এক শিবিরে।

কেস ঠোকা হোক। এক্ষুণি অবিলম্বে। ইয়ার্কি নাকি। সর্বস্ব পার করে এখন মুষ্টিভিক্ষের লোভ দেখাতে আসা! এই লোককে জেলে দেওয়া উচিত।

চন্দনেশ্বর আর এক কাঠি চড়িয়ে বলে, আমি বলবো, না দেওয়াটাই অন্যায়। তারপর নিজস্ব তীক্ষ্ন ব্যঙ্গের বাক্‌ভঙ্গিতে বলে, অবশ্য এই মহাপুরুষ ভ্রাতাদ্বয় হয়তো 'আহা হা পুরুত ঠাকুর।' বলে ক্ষমা করে দিতে চাইবেন।

মা বলে, 'রাখ তো তোর পুরুতি সেণ্টিমেণ্ট। এই দুই মহাপুরুষের এলাকাড়িতে তো যথেষ্ট লোকসান হয়েইছে। এখনো যদি—

যে সম্পত্তি বলতে গেলে কোনোদিনই ছিল না, অথবা যার সম্পর্কে কোনো মূল্যবোধও ছিল না, সেইটাই যেন হঠাৎ এই আকস্মিক ঘা-খাওয়া চিত্তের কাছে প্রায় 'সর্বস্ব' হয়ে উঠছে। অতএব মরণবাঁচন পণ করে লড়াইয়ে নেমে পড়া হোক। নিজমুখে যখন বলে গেছে যা আছে, তাই পঞ্চাশ ষাট হাজার, আসলে কোন না লাখ খানেক। আর যা হাপিস হয়ে গেছে? তার হিসেব? হায় হায়! আমাদের ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে লোকটা দিনে ডাকাতি করে চলেছিল! মার আবার ওকে কী পরম পূজ্য! কে জানে মার কাছ থেকেও কত কী বাগিয়েছে!

নাঃ। যা হয়েছে হয়েছে, আর নয় এখনি প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হোক।

হাঁ এককাট্টা হয়ে সবাই এই ক্যাবলাকান্ত প্রৌঢ় দুই ভাইকে স্বীকার করিয়ে ছেড়েছে তাদের অবহেলায় একটা মস্ত সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে গেছে।

শুধু সেই নতুন বৌটা?

নতুন বৌ হলেও এযুগের বৌ। তাই সে এই তপ্ত আলোচনার মধ্যে

এসে পড়ে অনায়াসে মন্তব্য করে বসে, 'আমি কিন্তু আপনাদের ওই ঠাকুরমশাইকে তেমন দোষ দিই না বরং মহৎই বলবো।'

দোষ দাও না। মহৎ বলবে!

তা কেউ যদি তার নিজের জিনিস রাস্তায় ফেলে ছড়ে ছড়িয়ে রাখে লোকে নেবে না? পৃথিবীটা যুধিষ্ঠিরে ভরা নয়।

বাঃ। চমৎকার। বেশ তোমার যুক্তি বৌমা। তো খুব ভালো! তো এর ওপর আবার মহত্ত্বটা কী?

বাঃ। উনি নিজে থেকে না জানালে, আপনারা জানতে পারতেন গ্রামেট্রামেও এখন জমির এত দাম?

চন্দন নিজ ভঙ্গীতে বলে, বলেছেন বোধহয় শেষ পর্যন্ত ফেঁসে যাবার ভয়ে।

কে ফাঁসাতে যাচ্ছিল? তোমরা তো জানতেও না ভাই তোমাদের একটা 'দেশ' আছে। সেখানে পিতৃপুরুষের ভিটেফিটে আছে!

আমাদের কোনোকালে জানানোই হয়নি।

তা সে অপরাধ ওই বুড়ো বামুনের নয়। গরীব মানুষ। বেওয়ারিশ মালে লোভ তো হতেই পারে। বরং ওঁর বাবা সাধন ভটচায্যি না কে, তিনি তো শোনা গেল যতদিন বেঁচেছিলেন ওই ঘোষাল বাড়িটিকে রক্ষা করার চেষ্টা করে চলেছিলেন। ঠাকুর সেবাও নাকি ভালভাবে—

আধুনিক কাল হলেও নতুন বৌয়ের এই কড়কড়ানি আবার কোন শাশুড়ীর সহ্য হয়? রেগে না উঠে পারা যায়?

অলকা রেগে উঠে বলেন, তুমি এত কথা জানলে কী করে বৌমা! তোমায় কে বলতে গেছে?

দিদার কাছেই শুনেছি মা।

খুবই নম্র গলা বৌয়ের, আমার সঙ্গে অনেক গল্প করতেন কিনা! তাঁর ছেলেবেলার কথা, স্বামীর হঠাৎ মারা যাবার কথা—দেশের বাড়ির কথা।

কি জানি বাবা! ক'দিনই বা দেখলেন তোমায়? তার মধ্যেই এত কথা? তো সাধন না কে না হয় খুব মহৎ। কিন্তু তাঁর কুলাঙ্গার ছেলেটি?

বৌ হেসে ফেলে বলে, তা সব কুলেই তো মাঝে মাঝে এক-আধটা কুলাঙ্গার জন্মায় মা। তবে আমার কিন্তু একবার যেতে খুব ইচ্ছে করছে।

আমায় নিয়ে যাবেন বাবা? গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, খুব যত্নটত্ন করে রেঁধে আপনাকে খাওয়াবো! ওই সিন্দুকটা আমার একবার দেখতেই হবে।

রেঁধে খাওয়াবে শ্বশুরকে? বলি সেখানে কি অবস্থা জানো তুমি? শুনলে তো?

তাতে কী। বৌ হেসে ওঠে! পিকনিক করতে তো মাঠের মাঝখানে গাছতলাতেও রান্নাটান্না করা হয়।

ওঃ। তার মানে শাশুড়ীকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা। আর শ্বশুরের সুয়ো হওয়ার ফন্দি! এ মেয়ে বেশ তুখোড় হবে। ভাবেন অলকা এবং শ্যামলী উভয়েই। কারণ ছোট শ্বশুর ঘোষাল সাহেব ভাইপো বৌয়ের এই ঘোষণায় উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠেছেন, বাঃ। এই তো চাই। গুড্ গার্ল।

কী বললি? আমাদের প্ল্যানে তুই নেই? মুফতে পেয়ে যাওয়া ওই ছুটির দুটোদিন তুই কলকাতায় থাকছিস না? মানে?

মানে আবার কী? থাকছি না ওটাই শেষ কথা।

ওঃ। একদম শেষ কথা। তো ওই দুটো দিন থাকাটা হচ্ছে কোথায়? পৃথিবীর বাইরে নয় নিশ্চয়! কী বললি নবীনগঞ্জ! সেটা আবার কোন স্বর্গভূমে?

এই অভাগা বঙ্গভূমেরই কোনো একখানে।

সেখানে আবার তোর কী কাজ।

আমার কোনো কাজ নেই। 'বস'এর তল্পিবাহক হয়ে যেতে হবে এই হুকুম।

ওঃ। বস! তো এই তো সেদিন মুলতুবি থাকা হনিমুন সারতে আন্দামান ঘুরে এলি। এখনো বোধহয় পকেটের ফুটো বোজেনি। আবার কিসের ওই কী যেন গঞ্জ।

নবীনগঞ্জ।

হুঁ! তো সেখানে ব্যাপারটা কী? মানে দ্রষ্টব্যটা কী?

দ্রষ্টব্য? শুনছি 'বস'-এর শ্বশুরের পিতৃপুরুষের ভিটে?

বস-এর শ্বশুরের পিতৃপুরুষের—

দেবল একটু থমকে কথাটা অনুধাবন করে। পরমেশ্বরের ঘাড়ে একখানা রুদ্দা বসিয়ে বলে, গোল্লায় যাও তুমি রাস্কেল। সেটা তো

তোরই বাপ ঠাকুর্দার—

বললাম তো আমার কিছুই নয় ভাই, সবই তাঁর। তিনি যেমন নাচান তেমনি নাচি।

উ.। জোর গলায় উচ্চারণ করছিস একথা? মুখে বাধলো না?

'সত্য' হচ্ছে ব্রহ্ম। মুখে বাধলে চলবে কেন?

এইতো সেদিন বিয়ে করলি, এক্ষুণি এতখানি অধঃপতন?

বিয়ে তো করিসনি শালা! বুঝবি কি করে 'বৌ' কী মাল?

তোদের সেই 'প্রেম করে' বেড়ানোর দিনগুলোতে তো মহিলাটিকে দেখলে মনে হতো না, এমন জাঁদরেল?

এই মরেছে। 'জাঁদরেল' কে বললো? মোটেই তা বলিনি।

জাঁদরেল নয় তো এমন 'যেমন নাচান তেমনি নাচি' অবস্থা হয় কী করে? অ্যাঁ?

ও তুই বুঝবি না। মানে এখন বুঝবি না। আগে ব্যাচিলারের খাতা থেকে নাম কাট তবেই—

আমার বুঝে কাজও নেই। শালা তন্ময়টাকেও দেখলাম, অমন আড্ডাবাজ স্ফূর্তিবাজ জলি লোকটা—স্রেফ আলুভাতে বনে গেছে। হাসির জোরটোর সব ফিনিশ। বৌ নাকি সব সময় সকলের সঙ্গে কথা বলার কালে অমন অট্টহাস্য পছন্দ করে না।

বলেছে শালা তন্ময়টা এই কথা?

বললো তো। আর বললো, বৌ বলেছে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে বেড়াবার বাসনাই যদি, তো বিয়ে করতে গেলে কেন? ওসব শখ ছাড়ো! তাই ছেড়েছে হতভাগা। সকাল সন্ধ্যে বাড়িতে ডিউটি, সংসারের খিদমদগারি, আর ছুটির দিন হলেই শ্বশুরবাড়ি ছোটা। ব্যস এই হচ্ছে রুটিন।

আর তন্ময়ের মা-বাবা বাড়ির লোক?

আছো কোথায় চাঁদু? সেই গোয়ালে এখনো পড়ে আছে নাকি তন্ময়ের বৌ? অফিসের থ্রু দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে ইনস্টলমেণ্টে একখানা ফ্ল্যাট নিয়েছে তো পার্ক সার্কাসে।

পার্ক সার্কাসে? কেন, সল্টলেক-এ নয় কেন?

ওটা শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি। যাক ছুটিটায় যখন কলকাতায় থাকছিসই না, তখন আর কেন? আচ্ছা চলি।

এই দেবল। শোন বাবা। আমার মিসেসটি ঠিক অমন নয়। তিনি আবার শ্বশুরের বংশের ভিটের সেণ্টিমেণ্টে—আচ্ছা টা টা।

কিছুদিন আগে একবার দেবল বলেছিল বটে, গুড্ ফ্রাইডের ছুটিতে লঞ্চে করে সুন্দরবন অভিযানের একটা প্ল্যান আছে ওদের। তবে সেই মহিলা। যে আসতে পারো এসো। 'ব্যাঘ্র প্রকল্প, কুমীর প্রকল্প' দেখার একটা সুযোগ জুটছে —।

ব্যাপারটায় আগ্রহ ছিল পরমেশ্বরের, কিন্তু ঠিক এই সময়েই ওই নবীনগঞ্জ!

সর্বোত্তমা শ্বশুরের কাছে বলেছে, 'সেই সিন্দুকটা দেখতেই হবে বাবা। আর শ্বশুরের ছেলের কাছে বলেছে, সেই তলোয়ারের মতো মেয়েটাকে আমাকে দেখতেই হবে।'

না, মামলা অবশ্য ঠুকে বসেননি ত্র্যম্বকেশ্বর ঘোষাল আর ত্রিগুণেশ্বর ঘোষাল তাঁদের কুলোপুরোহিত বংশাবতংস শ্রীল শ্রীযুক্ত মোহন ভট্টাচার্যের নামে। কারণ যদিও লোকটার অসততার পরিচয় পাওয়ামাত্রই সবাই যেমন জ্বলে উঠেছিল এবং তদ্দণ্ডেই লোকটাকে ঘানি গাছে জুড়ে দিতে চাইছিল, পরে সেটা একটু থিতোলো। এই ত্রিগুণেশ্বর এবং তস্য জায়া দুর্গাপুরে ফিরে যাওয়ার আগে পরামর্শ করে স্থির করলেন, এখন ওটা করা ঠিক হবে না। এখনো আমরা ওর হাতে। আর নারায়ণ না কি'র দেবত্তোর, না কি যেন কী আর তার কাগজপত্র কোথায় কে জানে? 'আছে' সেটা ওই মোহনই বলেছে বটে, তবে চেয়ে নেওয়ার সময় তো হয়নি। এমনকি নারায়ণের ঘরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আসাও হয়নি।

সে যাক। নীলু বলেছে, এখন যদি যাও তো ভাঙাবাড়িতেই উঠতে চাইবে সেণ্টিমেণ্টের দোহাই দিয়ে আর ভিজে বেড়ালটির মতো থাকবে। পাড়ার লোকের সঙ্গে যোগাযোগটা করতে হবে। তাদের কাছেই সব খবর!

তো ওরা চলে যাবার ক'দিন পরেই এদিকে রওনা দিল এরা। সর্বোত্তমা, তার বর আর শ্বশুর এবং দাসী রমার মা। বর একবার সেই 'সুন্দরবন' অভিযানের ক্ষীণ আশা মাথায় রেখে আরো গাঢ় স্বরে বলেছিল বাবাই যখন যাচ্ছেন, তখন আর আমার যাওয়ার কী দরকার?

বৌ অনায়াস গলায় প্রশ্ন করেছিল, বাবা আমার খিদ্‌মদ্‌গারি করবেন?

খিদ্‌মদ্‌গারি করতে তো শাশুড়ীর মুখে মেঘ নামিয়ে তাঁর খাস দাসীটিকে নিয়ে যাচ্ছ।

চমৎকার! সে যা করবে, সেইগুলো করাবার জন্যে তোমায় দরকার? সে আমায় নিয়ে গাঁ-টা দেখিয়ে বেড়াবে? পাড়ার লোকের বাড়ি গিয়ে গিয়ে পরিচয় করাবে? আর আমার ইচ্ছেমতো—

অতসব করবে তুমি গিয়ে?

করব না? বাঃ! তবে যাচ্ছি কেন? আগে বাড়িটাকে তো ভালো-মতো সারিয়ে নেওয়া দরকার।

চমকে উঠেছিল পরমেশ্বর, কী? বাড়িটা সারিয়ে নেওয়া? মানে? যাওয়া হচ্ছে তো যেমন আছে তেমনি বেচে দিতে।

কে বেচতে দিচ্ছে?

তার মানে? কী আবোল তাবোল চালাচ্ছো?

সর্বোত্তমা ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে চুপ করবার ইশারা করে বলে, আরে মশাই, সে আমার দারুণ একটা প্ল্যান আছে। মোটেই এখন ফাঁস করে দিও না।

আমি কি ফাঁস করবো? নিজেই তো অন্ধকারে।

আপাততঃ অন্ধকারেই থাকো হে। নচেৎ প্ল্যান পাশ করিয়ে নেওয়া শক্ত হবে। আগে পরিস্থিতিকে কব্জা করে আনি, তবে।

পরমেশ্বর গলার স্বর নামিয়ে বলেছিল, সেটি তো তোমার কাছে কিছুই নয়। একমাত্র আমার মা জননীটিকে ছাড়া সকলকেই তো দিব্যি কব্জা করে ফেলেছ। এমনকি দুর্গাপুরে সম্প্রদায়কেও।

সর্বোত্তমা মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিল সেরা, সহজ হয়ে যাবার অন্য একটা সূক্ষ্ম কারণও থাকতে পারে।

সেটা আবার কী কারণ?

থাক। ছেলেমানুষদের সব কথা শুনতে নেই।

ছেলেমানুষ!

নয়তো কী! ঘরে সংসারে পুরুষমানুষ জাতটা তো ছেলেমানুষই। তাদেরকে যা বোঝানো যায় তাই বোঝে, যা বিশ্বাস করতে বলা হয়, তাই বিশ্বাস করে।

ও! জাতটাকে আগে থেকেই এত চিনে ফেললে কী করে বলতো?

আগে থেকে মানে? জন্ম থেকেই তো চিনে চলেছি। দেখার চোখ থাকলে চোখ-ফোটা থেকেই সবকিছু চিনে ফেলা যায়। দাদাকে দেখলাম, ছোটমামাকে দেখলাম, যতসব 'তুতো কোম্পানী।' দাদা কাকাদেরও দেখে চলেছি আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি। যেই না মাথা মুড়োচ্ছে, সেই মাত্রই মাথাটাকে বিকিয়ে বসছে।

ও। সেই অভিজ্ঞতাটিই তাহলে নিজেও কাজে লাগাচ্ছ?

যদি তাই বল তো তাই।

এই। ইস। রাগ হয়ে গেল?

রাগ কিসের? সত্যি কথাই তো। এই যে এখন তুমি বন্ধুসঙ্গ ছেড়ে আমার ইচ্ছের পুতুল হয়ে -

পরমেশ্বর তাড়াতাড়ি বলে, বন্ধুসঙ্গের থেকেও অধিক মধুর সঙ্গের প্রলোভনেই যে যাচ্ছিনা তা কে বলেছে? তুমি ওইখানে চলে যেতে, আর আমি ওই হুজুগেদের দলে গিয়ে জুটতাম? রাম কহো! সারাক্ষণ বেঁধে মারতো। সব বাজে লাগতো।

সর্বোত্তমা একটু হেসে বলে, একটা ব্যাপারে অবশ্য তোমাদের কাছে নতিস্বীকার করতেই হয় আমাদের।

আমাদের কাছে তোমাদের? নতিস্বীকার? সেটা আবার কোন ব্যাপারে হে?

ওই যে তোয়াজি ভাষার নিপুণ প্রয়োগ। আমরা এতটি পারি না।

তা এসবই তো সেই প্রাক্‌যাত্রাকালে।

তবে মেয়েরাও যে তোয়াজি ভাষা একেবারে জানে না, তা বলা যায় না। ক্ষেত্র বিশেষে ঠিকই সে ভাষা কাজে লাগায়। যাত্রাকালে প্রণামপর্ব সমাধা করে সর্বোত্তমা শ্রীমতী অলকা ঘোষালের মেঘাচ্ছন্ন মুখের দিকে না তাকিয়েই (অনুমানে অবস্থা অনুভব করেই হয়তো) ভারী নরম আর কুণ্ঠিত গলায় বলল, রমার মাকে নিয়ে যাচ্ছি, আপনাকে খুবই অসুবিধেই ফেলা হলো। শুধু বাবার সুবিধে অসুবিধে ভেবেই! জানেনই তো আমি একটি রাম অকর্মা।

অলকা ঘোষাল পুত্রবধূর চিবুকে নামকাওয়াস্তে একটু হাত ঠেকিয়ে ভারী গলায় বলেন, অকর্মা হবে কেন? খুবই করিৎকর্মা। সবাই জানে।

নিজেও জানো। তবে একটু সাবধানে থেকো। ভাঙাচোরা বাড়ি, সাপ-খোপ আছে কিনা ভগবান জানেন। রমার মা যাচ্ছে তবু ভরসা। আমার আবার অসুবিধে! সংসারটাই তো নিয়ে যাচ্ছো। আমার একটা মানুষের জন্যে কত দরকার?

হুঁ। ওইখানেই গোলমাল। নিজে সাহস করে সেই একটা অসুবিধেকর জায়গায় যেতে পারলেন না, অথচ বৌ তাঁরই স্বামী পুত্রকে নিয়ে ড্যাং ড্যাং করে সেখানে চললো, এতে কী মুখে মেঘের বদলে জ্যোৎস্না ফুটবে?

তা অলকা ঘোষালের মানসিকতাটা স্বাভাবিকই, কিন্তু তার পরম গুরু লালু ঘোষালের? লোকটা কী বলে অমন একটা অদ্ভুত কাজ করে বসল? সৌজন্য? চক্ষুলজ্জা? ভালবাসা? কোনোটাই তো অঙ্কে মেলে না। তার মানে সেই 'পাঁচ খোপের' কারবার? তাই লালু ঘোষাল মোহন ভটচায্যির নামে কেস ঠোকার বদলে তার ছেলেপুলের নাম করে কলকাতার 'ভালমিষ্টি' নিয়ে যান একটি রাশ।

নীলু দেখলে হয়তো বলতো, 'ভাবা যায়?'

কিংবা হয়তো বলতোও না। নীলুও হয়তো তখন 'অন্য খোপে' ঢুকে আসতো।

তবে বড় ভাল আর বুদ্ধিমতী মেয়ে লালুর ছেলের বৌটি। মুখ দেখে মনের ভাব আঁচ করে ফেলতে পারে আর অনুকুল বাতাস এনে হাজির করে ফেলে।

বাড়িতে কথাটি নয়, ট্যাক্সিতে উঠে একটু এগিয়ে লালু ইতস্তত করে বলে ওঠেন, চাবিটা নিতে আগে ভট্চায-বাড়িতেই যেতে হবে।

একটু বিরতির পর একটু অস্বস্তি হচ্ছে। সেদিন ওদের অত যত্ন আত্তি পেয়ে এলাম –

শ্বশুর বৌ পিছনের সিটে। ছেলে সামনের সিটে চালকের পাশে। তবু বাবার কথা কান এড়ায় না। আর শুনেই ছেলে হেসে উঠে বলে, তাতে বিবেকের কামড় খাবার দরকার নেই বাবা। সে ভদ্রলোক তো নিজে থেকেই তোমার অনেক খেয়ে রেখেছেন। অনেকদিন এক্সটেনশান চলবে।

বৌ বিনা দ্বিধায় শ্বশুরের সামনেই বরকে ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, তুমি থাম তো। সত্যি বলতে, আমিও তাই ভাবছিলাম বাবা। বাড়িতে

মার সামনে বলতে সাহস পাইনি। মানে ইয়ে রমার মাকে নিয়ে যাচ্ছি তো। মা একটু কষ্ট পাবেন। তা স্টেশনে যেতে যেতে তো অনেক মিষ্টির দোকান পড়বে বাবা। অন্য জায়গার লোকেরা কলকাতার মিষ্টিকে বেশ মান্যের চোখে দেখে শুনেছি।

অতএব আর কী?

দু' জায়গায় ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে নেওয়া হয় 'কলকাতার ভালো মিষ্টি'।

কিছু নোনতাও নিয়ে নিন না বাবা। আমাদেরও তো গিয়েই প্রথমে আর এক রাউণ্ড চা হতে হবে। তার সঙ্গে চাই। তো কিছু বেশি করেই নেবেন। ওনাদের জন্যেও।

অম্লান বদনে তাও নেন লালু। এবং নেন বড় স্বস্তি আর আনন্দের সঙ্গে। আহা এমন একটি পৃষ্ঠপোষক থাকা খুবই জরুরি। যদি শুধু ছেলের সঙ্গে আসতেন?

এমন অনুকুল বাতাস বইতো কী? আর তার সঙ্গে ছেলের মা থাকলে?

থাক। সেকথা না ভাবাই ভালো!

সমাজ পুরুষশাসিত।

কিন্তু পুরুষগণ? তারাই কী সর্বদা স্বশাসিত?

তাদের জীবনও কী অলক্ষিত অদৃশ্য একটি শাসনের ভয়ে সংকুচিত হয়ে থাকে না?

শুধু এ যুগের মেয়েদের দোষ দিলে চলবে কেন? চিরকালই আছে। এমনও হয় অতি উপার্জনশীল পুরুষকেও 'দানের হাতটাকে' বিকশিত করতে হয়, লুকোচুরির পথে। দুঃস্থ আত্মীয়কে সাহায্য করতে মনিঅর্ডার করতে হয়, অফিসের ঠিকানা থেকে। মাইনে বাড়ার খবরটা চেপে যেতে হয় হয়তো বিধবা বোনের মাসোহারা বাড়ানোর ইচ্ছেয়।

সে যাক।

আপাতত লালু ঘোষাল একরাশ খাবার-দাবার গাড়িতে উঠিয়ে বড় নির্মল আনন্দবোধ করলেন। আর কৃতজ্ঞ হলেন, ওই প্রায় 'প্রখরা প্রগলভা' মেয়েটার কাছে।

তা মেয়েটাকে প্রগলভাই বলতে হয় বৈকি। নাহলে—সারাপথ

শ্বশুরের মঙ্গে বকবক করতে করতে চলে ?

চাবিটা হাতে নিয়ে মোহন ভট্চায্ বেরিয়ে এলো প্রায় বিহ্বলের মতো। সে কী স্বপ্ন দেখছে ? ...লালু ঘোষাল তার দরজায় হাস্যবদনে দাঁড়িয়ে ? আর হাতে ? দুহাত বোঝাই খাবার।

এ কী দাদা ! এসব কী ! না না এ কী ! ও আপনি নিয়ে যান সঙ্গে ছেলে-বৌ এসেছে—

কী আশ্চর্য ! ওদের জন্যে কী আসেনি ? এ আমি এখানে ছেলে-পুলের জন্যে নিয়ে এলাম একটু। নিন ধরুন।

মোহন অসহায় গলায় ডাকল, ঝর্ণা।

কাছেই ছিল অবশ্য। ছুটে এলো।

এই দ্যাখ তোদের জ্যেঠু তোদের জন্যে একগাদা খাবারটাবার।— ঘরে নিয়ে যা তোদের মার কাছে দিগে।....কী অন্যায়। কী অন্যায়। আমি কিছুই করতে পারিনি—

আবার সেই হাতকচলানি।

ধুলোবালি হয়ে আছে, একটা লোককে ডেকে আনি একটু সাফ করতে।

কেন, সেদিন তো ঘরটরগুলো কিছু খারাপ দেখিনি।

সে তো আগের দিন ধোওয়া-মোছা করিয়ে রাখা হয়েছিল। আজ না হয় ঝর্ণার মা-ই গিয়ে একবার একটু ঝাড়ু বুলিয়ে দিয়ে আসুক।

কী যে বলেন। ছি ছি। সঙ্গে 'কাজের লোক' আনা হয়েছে একটা।

ওঃ ! তাই। তো ন্যাতা বালতি ঝাঁটার তো দরকার।

কিছুটা দূরে দাঁড়ানো সাইকেল রিকশা থেকে রমার মা ডাক দিয়ে বলে বাবু ! বৌদি বলতে বলছে, সবই এসেছে।

আশ্চর্য হয়ে যায় বাপ-বেটা দু'জনেই।

সবই এসেছে। কী অভাবিত ব্যাপার।

খানিক পরেই দেখা গেল ধোয়ামোছা দালানের মেজেয় একখানি সুদৃশ্য শতরঞ্জি পাতা হয়েছে, তার ধারের দিকে ফুলকাটা কাগজের প্লেটে কলকাতা থেকে আনা সেই সিঙাড়া খাস্তা কচুরি নিমকি। আলাদা প্লাস্টিকের প্লেটে বড়সড় দুটো রসগোল্লা।....আর অদূরে জনতা স্টোভে, কেটলিতে ফোঁস ফোঁস করে জল ফুটছে। কাছে চায়ের সরঞ্জাম।

লালু প্রায় স্তম্ভিভাবে তাকিয়ে বলে ওঠেন, বৌমা! শব্দটা যেন আর্তনাদের মত।

বৌমা একটু চকিত হয়ে তাকায়।

বলি, সঙ্গে একখানা আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নিয়ে এসেছ না কী? এ সব কী? পরমেশ দেখছিস?

পরমেশ্বর হাসি চেপে বলে, দেখছি তো।

তোর মা, ইয়ে—ভাবতে পারতো?

বলে ফেলেই অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকান। রমার মা শুনতে পায়নি তো? তাহলেই তো সর্বনাশ। কী ভাগ্যি নেই। বৌ তাড়াতাড়ি প্রায় বকে দেওয়ার মতো করে বলে আঃ! কী যে বলেন বাবা! মাকে নিয়ে কোথাও বেরিয়েছেন কখনো? মেয়েরা কোথাও যেতে হলে সব গুছিয়ে নেয়। অসুবিধায় পড়ার ভারী ভয় মেয়েদের। তবে জল খেতে হবে কিন্তু বোতল ধরে। ফ্রীজ থেকে গোটা চারেক বোতল বার করে এনেছিলাম তাতেই কাজ চালাতে হবে। আহা ফ্রীজ শুনে যেন ঠাণ্ডা জলের আশা করবেন না! ও এখন দিব্যি গরম হয়ে উঠেছে। তবে রমার মা কাছের কোথাকার টিউবওয়েল থেকে চায়ের জলের জন্যে জল নিয়ে এলো, খুব ঠাণ্ডা। সবই রমার মার অবদান বাবা! কিন্তু বাবা আসল ব্যাপারটার কী হবে? আমার তো আর ধৈর্য ধরছে না।

বলল ওই ভাবে। তবে নেহাৎ বানানো কথাও নয়।

'আসল' ব্যাপার হচ্ছে সেই সিন্দুক।

বাড়ির আর ঘরের দরজা খুলে ঢুকেই ত্র্যাম্বকেশ্বর ঘোষাল নামের লোকটা আবারই স্রেফ 'লালু' হয়ে গিয়ে ছুটে এসে দেখেছিলেন, সিন্দুকটা আছে তো? নীলু বলেছিল হয়তো পরে এসে দেখবে হাপিস হয়ে গেছে।

নাঃ। হয়নি।

এবং দেখলেন ঠিক সেই রকম অবস্থায় আছে। সেই মাকড়সার জালের মশারির মধ্যে শুয়ে আছে ধুলোর গালচে ঢাকা দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলে বৌ দুজনেই এসে দাঁড়িয়েছে।

ও বাবা! এর চাবিটা চেয়ে এনেছেন তো?

ওর চাবি! এর চাবির খবর রাখে না ভট্‌চায্‌। সেবারেই বলেছিল।

এ মা! সে কী? আমি তো ভেবে রেখেছিলাম এসেই আগে ওটা

খুলে দেখব কী আছে! অবশ্য যা অবস্থা দেখছি মুখে রুমাল বেঁধে ঝাড়তে হবে।

পরমেশ্বর আস্তে বলে তার মানে বোঝাই যাচ্ছে বহুকাল কারো হাত পড়েনি।

তো এখনতো পড়াতে হবে। ওবাবা বলুন না আপনার ঠাকুর-মশাইকে, খুঁজেটুজে দেখুন! চাবি কোথায়!

কিন্তু শুধুই কী সিন্দুক?

আরো একটা 'দ্রষ্টব্য' বস্তু দেখাটাও যে বিশেষ জরুরি ছিল সর্বোত্তমা নামের মেয়েটার।

মোহন ভট্চায্ অবশ্য একবার এসে ঘুরে গেছে। লালুর ব্যবহারে বেশ বুকের বল করেই নিবেদন করেছিল। এবেলাটা অন্ততঃ ওখানেই দুটো ডালভাত—

লালু সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ওর জন্যে ভাববেন না, ও হয়ে যাবে। সঙ্গে আমার মা লক্ষ্মী এসেছেন।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আহা দেখতেও যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, এ কী আমায় আবার চা কেন?

সর্বোত্তমা বলে, বাঃ। চা হয়েছে খাবেন না?

তা হোক। তা হোক। তোমাদের এই অবিলির মধ্যে—

কিছু অবিলি নয়। নিজেরা তো খেলাম। চা তো আপনি ভালোবাসেন। কলকাতার বাড়িতে দেখেছি।

কৃতার্থম্মন্য মোহন বলে তা ঠিক! তা ঠিক। আর তো কোন নেশা নেই. এই একটাই নেশা! তাছাড়া মা লক্ষ্মীর হাতের চা! তার স্বাদই আলাদা। বাড়িতে আমরা যা চা খাই দাদা। নিমের পাঁচন।

সেকি কেন?

কেন হবে না বলুন? বাজারের সেরা সস্তামার্কা চা। তাকে ভেলিগুড় দিয়ে বানানো! আর যিনি বানান—থেমে যায়।

এ এমন একটা প্রসঙ্গ যে, কোনো মন্তব্য করা চলে না। তাই হঠাৎ একটু স্তব্ধতা নামে।

একটু পরে খালি চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে মোহন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে বলে. ভগবান যাকে মারে, তার সব দিকেই ষোল-

কলা। তা নইলে সারের সার প্রথম সন্তান বড়মেয়েটা! তার কেন মাথার দোষ!

মাথার দোষ!

চমকে ওঠে উপস্থিত জনেরা।

মোহনের গলার স্বর খাদে নামে, আইবুড়ো মেয়ে, পাছে পাঁচকান হয় বলে কাউকে বলি না। তবে আপনার সঙ্গে তো আলাদা সম্পর্ক।

লালু আস্তে বলেন, কিন্তু দেখে তো তা মনে হয় না!

ওই তো। এখনো দেখে চট করে বোঝা যায় না, তাই চেপেচুপে রাখা যাচ্ছে! ভবিষ্যতে কী হবে নারায়ণই জানেন। হঠাৎ ক্ষেপে গেলে আর রক্ষে থাকে না। যা তা এলোপাথাড়ি কথা বলে। আর যত আক্রোশ যেন এই হতভাগা বাপব্যাটার ওপর। সবই অদৃষ্ট। দেখবেন যেন পাঁচকান না হয়। বলে উঠে পড়ে বলে, চলি।

যেতে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ায়।

নারায়ণের ঘরে সন্ধ্যে আরতির সময় ছেলেকে নিয়ে, মা লক্ষ্মীকে নিয়ে আসবেন দাদা নারায়ণের ঘরে।

আবার সবটা স্তব্ধতা।

একেবারে চোখকানের সীমানার বাইরে চলে যাওয়ার সময়ের আন্দাজের পর পরমেশ্বর বলে ওঠে বাবা। তাহলে তো আমাদের বোধহয় মস্ত একটা ভুলই হয়েছে।

লালু অন্যমনস্ক ছিলেন। যেন পিছিয়ে সেই দিনটায় পেঁছে গিয়েছিলেন। সেদিনকার সেই আগুনের মতো মেয়েটার, কথাবার্তা ভঙ্গী ফিরে উল্টে দেখছিলেন। 'যত আক্রোশ বাপের ওপর।' কিন্তু কেনই বা? মাথা খারাপদের আচরণের কী সবসময় কারণ থাকে? তাহলে তো—

ছেলের কথায় একটু চমকে উঠে বললেন, ভুল? কী ভুল হয়েছে?

পরমেশ্বর বলে, উনি যা বলে গেলেন, তাতে তো মনে হচ্ছে, ওঁর সেই মেয়ে আজে বাজে যা তা বলেছিল। হয়তো আসলে লোকটা অনেস্ট।

সর্বোত্তমা চায়ের সরঞ্জাম একটা বেতের বাস্কেটের মধ্যে গুছিয়ে তুলতে তুলতে, মুখটা ফিরিয়ে একটু হেসে বলে, চট করে 'আসল'টা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে নেই।

তার মানে ?

মানেটা—

একটু থেমে আরো একটু হেসে বলে, নাঃ, থাক। নিজস্ব ধারণা চট করে লোকসমাজে প্রকাশ করতে নেই।

কী মুশকিল ! কী বলতে চাও বলবে তো ?

কিছু তো বলতে চাইনি।

না চাও। ভাবছো তো কিছু একটা ?

বললাম তো 'ভাবনার' কথা বলতে নেই।

লালু ছেলে-বৌয়ের বাক-বিতন্ডার মধ্যেই বলে ওঠেন, তোমার কী মনে হচ্ছে, 'মেয়ের মাথায় দোষ আছে' বলায় ভটচায্যির কোনো মতলব আছে বৌমা ?

বৌমা বেশ জোরে হেসে উঠে বলে, আমার মনে করাকরির কথা বাদ দিন বাবা। শেষে বোকা বনে অপদস্থ হয়ে যাবো ? দেখাই যাক না। তবে কাউকে যেন জিগ্যেস করে বসবেন না। 'পাঁচকান করা' মানা।

রমার মা একটা প্লাস্টিকের বালতি ভরে জল নিয়ে এসে সাবধানে নামিয়ে রেখে বলে, একটা কিছু ঢাকা দাও বৌদিদি। ওই জলই তো খেতে হবে। তো জল শুনলাম ভালো। এদিককার সব্বাই নাকি ওই টিপকলটা থেকে খাবার জল নেয়। তো দেখে মালুম। টিপকলের ধারে ভিড়ে ভিড়। কারা বলাবলি করছিল তাদের পাড়ার টিপকলের জল না কী বোদা। তাই এত দূর থেকে জল নিয়ে যেতে আসে।

বৌদিদি বলল, তাহলে তা ভালোই। এখন সন্ধান করে দেখো, মাটির হাঁড়ি কুঁড়ির দোকানে সোরাই কি কলসী কোথাও পাওয়া যায় কিনা।

ওদের সঙ্গে আশ্চর্য উপায়ে একটা ফোল্ডিং ডেক চেয়ারও এসেছে, এবং পরমেশ্বর তাই দেখে বৌকে যথেষ্ট বিদ্রূপ করেও সেটাকে পেতেই ঘরের মধ্যে বসে আরাম করছে। হাতে একটা হাতপাখা। লালু কোন-দিকে যেন বেরিয়েছেন। পরমেশ্বর ঘরের মধ্যে থেকেই বলে ওঠে, কুঁজো কলসী ! হাঁড়িকুঁড়ি ! তুমি কি এখানে স্থায়ী সংসার পেতে বসতে চাও না কি ?

সর্বোত্তমা এগিয়ে দরজার কাছে গিয়ে বলে, যদি চাই ?

অ্যালাউ করব না।

ওঃ। তোমার অ্যালাউয়ের ধারটা ধারছে কে ?

ধারতেই হবে। আমি আমার প্রাণের প্রিয়টিকে ঘামে গলে যেতে দিতে রাজী নই। কী অবস্থা হয়েছে দেখেছ ?

বলে হাতপাখাখানা এগিয়ে ধরে বলে, নাও একটু হাওয়া খেয়ে নাও।

তুমি খাও। আমার দরকার নেই।

এনেছ তো নিজেই ভেবেচিন্তে।

সে তোমাদের কথা ভেবে।

ওঃ। তুমি গরম প্রুফ ? দূর! এই মার্চ মাসেই এত গরম। অসম্ভব।

মনে করো লোডশেডিং। সাঁওতালডিতে দারুণ বিপর্যয়। বিদ্যুৎ বিভ্রাট।

তোমার এত কথা যোগায়। আশ্চর্য! আচ্ছা, বাবা কোনদিকে গেলেন এই রোদে ?

তোমার বাবা! তুমি খোঁজ রাখো না ? আমায় জিগ্যেস করছো ?

আমার ? 'আমার' বলতে তো আর কোথাও কিছু রাখিনি হে মহিলা! সবই তোমার।

হুঁ, তাতে খুব সুবিধে। কী বল ? থাক এখন আড্ডা দেওয়ার সময় নেই। দেখি রমার মা কী করছে।

তা দেখা গেল রমার মা নেহাৎ মন্দ কিছু করেনি। দাওয়ার নিচে সিঁড়িতে একপাশে ইঁট সাজিয়ে দিব্যি একখানা উনুন বানিয়ে তাতে কাঠকুটো জেবলে ডেকচিতে খিচুড়ি চাপিয়েছে। এক দু দিনের মতো ব্যবস্থা তো আনা হয়েছে।

সর্বোত্তমা চমকে বলে, ওমা! কাঠ জেবলেছ ? কেন জনতায় হতো না ?

হবে না কেন বৌদিদি। তবে একদিনেই কেরোসিনটা ফুরিয়ে যেতো। এখানে কী পাওয়া যায় না যায় জানা নাইতো, সাবধান হওয়া ভাল।

রান্নায় ধোঁয়ার গন্ধ হবে না ?

কী যে বলেন বৌদি! জগৎসুদ্ধু লোক চিরকাল কাঠের জ্বালেই রেঁধেছে। এখনো গাঁয়ে গঞ্জে কী করে ? তোমারগে কিছুকাল আগেও

তো বে'বাড়ি কাজের বাড়িতে হালুইকর ঠাকুররা কাঠের জ্বালে যজ্ঞির রান্না রেঁধেছে।

রমার মার এই এক দোষ, শুধু বেশি কথা কওয়াই নয়, নিজের কাজটিকে সমর্থন করাতে যত পারবে উদাহরণ যোগাড় করতে বসবে। তবু ওকে নিয়ে এসেছে সর্বোত্তমা ওর নিপুণতা আর কর্মক্ষমতার জন্যে। যে কোনো অসুবিধেজনক অবস্থাই ঘটুক রমার মার ওপর ভার দিলে ঠিক ম্যানেজ করে ফেলবে। দু'এক দিনের জন্যে হলেও, কোনো অজানা জায়গায় গিয়ে পড়ে রেঁধে খেতে হলে যে কী কী অবশ্য প্রয়োজনীয়, সে হিসেব ওর কাছেই ছিল।

রমার মা আবার বলে, তো 'চালেডালে' তো হচ্ছে, আর কী হবে বলো।

সে তোমার যা ইচ্ছে। আমরা এখন তোমার প্রজা। যা খাওয়াবে তাই খেয়ে বেঁচে যাবো।

এই! এই জন্যেই বাড়ির কাজের লোকেরা বৌকে এমন প্রেমের চক্ষে দেখে। নির্দেশ দেয় না 'তোমার যা সুবিধা' বলে স্বাধীনতা দেয়। আর গিন্নীটি? বৌয়ের শাশুড়ীটি? চায়ে কতটা চিনি দেবে, রান্নায় কতটা তেল মশলা দেবে তা নিয়েও টিকটিক করবে!

রমার মা হৃষ্টচিত্তে বলে, খিচুড়ি হবে আন্দাজ করে, বেগুনীর বেবস্থা করে আনা হয়েছে তো; তাই হোক।

ওমা! সত্যি! রমার মা! কখন করলে ওসব?

বাঃ। আপনি পর্শুদিনকে আমার হাতে গাদা খানেক টাকা দিয়ে বললেন না, রমার মা তুমি বুঝে সুঝে যা দরকার কিনে এনে গুছিয়ে নেবে! আপনার কাছে কাজ করে সুখ আছে।

'সুখ' তো থাকবেই। কিছু আনতে দিয়ে, ফেরৎ পয়সা নিতে চায় না। বলে, ও তোমার কাছেই রাখো বরং। আবার হঠাৎ কিছু দরকার হলে—

মস্ত বড়লোকের একমাত্তর মেয়ে। ওনার তো আরো অনেক বড়-মানুষের বাড়ি বে হতে পারতো। নেহাৎ নাকি দাদাবাবুর সঙ্গে ভাব ভালবাসায় পড়ে—তো বাপ রাগঝাল করেনি। খুব ঘটা করে মেয়ের বে দিয়েছে। এখনো মেয়েকে মোটা টাকা হাতখরচ দেয়। তবু তো শুনি চাকরি করবে। তা করুক। চব্বিশ ঘণ্টা ওই রাশভারী শাশুড়ীর

সঙ্গে থাকা—

অনেকদিনের লোক রমার মা। সুয়ো ছিল 'ঠাকুমার'। স্বর্ণচাঁপা খুব সুচক্ষে দেখতেন ওকে। তাতেও গিন্নীর অপচ্ছন্দ ছিল। বই খাতার লেখাপড়াই না হয় জানে না রমার মা, তবে মানুষকে পড়তে ভালই জানে।

কাঠের উনুনে জ্বাল বসিয়ে দিতে দিতে রমার মা বলে ওঠে, টিপ-কলের ধারে একটা মোটামতন গিন্নী আপনাদের সব কথা শুধোছিল।

আমাদের কথা ? কী কথা ?

এই এতকালের পোড়োবাড়িতে কেন আসা! কে কে এসেছে? ক'দিন থাকা হবে ? কলকাতার বাড়িতে আর কে কে আছে ? বৌয়ের কতদিন বে হয়েছে, ছেলেপুলে হয়েছে কিনা এই সব।

তো তিনি কে, তা তুমি জিগ্যেস করোনি ?

করেছিলুম। তো বললো, আপনাদের নাকি দূর সম্পর্কের জ্ঞ্যাতি। ....তা'পর একটা কথা শুধোলো। বললো, যদি বেড়াতে যাই, বৌ অপছন্দ করবে ? আজকালের মেয়েরা তো বেশিরভাগই দেমাকি হয়!

কী মুশকিল! বেড়াতে এলে অপছন্দ করবো! তাই আবার হয় না কী ? এখানের সকলের সঙ্গে তো চেনাজানা করারই দরকার। তুমি কী বললে ?

কী আবার বলবো ? বললুম, আমাদের বৌদিদি অমন না। মানুষ-ভালবাসে, সবাইকে মান্যি দেয়।

খিচুড়ির তলা ধরে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি ডেকচি নামিয়ে সামাল দেয় রমার মা।

লালু ফিরে আসেন।

ছেলে খুব রেগে রেগে বলে, আচ্ছা বাবা, এই রোদে বেরোলে। তোমার কী কাজ ? তাও একটা ছাতাফাতা নেই।

কে বললে নেই ? ছত্রপতি হয়েই গিয়েছিলাম বাবা।

লালু হা হা করে হেসে ওঠেন, বৌমার আমার সব দিকে হুঁশ! একখানা ফোল্ডিং ছাতাও এনেছে! সেটাই বেরোবার সময় হাতে ধরিয়ে দিল। দিব্যি একখানা ছবি আঁকা লেডিজ ছাতা মাথায় দিয়ে ঘুরে এলাম। মন্দ লাগল নারে। জানলাম ছুটির দিন বলে, আজ পথে লোক

চলাচল রয়েছে, 'ডেলি প্যাসেঞ্জার বাবুরা শনিবারের বাবুরা' সব আজ বাড়িতে !

চেনা কেউ বেরোল ?

চেনা আর কোথায় পাবো ? পরিচয়ে চেনা 'ঘোষালবাড়ির' লোক। যাদের সঙ্গে কথা হলো দেখলাম খুব কৌতূহল হঠাৎ ওই পোড়ো-বাড়িতে ফ্যামিলি নিয়ে বেড়াতে আসার কারণ কী ? বাড়ি সারাব নাকি, বেচে দেব ? জমির দাম আজকাল খুব বেশি। ভাঙা ইঁট পাটকেলেরও নাকি বাজার দর আছে সুরকিকল-এর জন্যে। এই সব। তবে ভটচায্যির সম্পর্কে সকলেরই যেন বাঁকা ভাব।

সর্বোত্তমা হেসে ফেলে বলে, সেটা তো হবেই বাবা ! একজন কেউ যদি একটা বেওয়ারিশ মালের ওয়ারিশানের পোস্ট নিয়ে বসে থাকে, পাবলিককে ঠেকিয়ে রাখে, লোকে তাকে সুচক্ষে দেখে নাকি ? কিন্তু সিন্দুকের কথা কেউ কিছু বলল ?

সিন্দুকের কথা। না বাবা, তা তো কই কিছু—

আপনিও সে কথা তোলেননি ?

না বাপু। সে আমার মনে পড়েনি।

পরমেশ্বর বলে ওঠে, তোমার যেমন ওই সিন্দুকটা ধ্যানজ্ঞান, তা আবার কার হতে যাবে ?

কী আশ্চর্য ! তোমাদের কোনো কৌতূহল নেই ?……

হঠাৎ গলা খুলে হেসে উঠে বলে, আচ্ছা বাবা, এমনও হতে পারে, খুলে দেখলেন ওর মধ্যে সিন্দুকভর্তি রাশিরাশি টাকা। কাগজের টাকা নয়, রাজামার্কা রানীমার্কা খাঁটি রুপোর টাকা। আপনার সেই কিপটে ঠাকুর্দা বুড়ো চিরদিন কৃচ্ছ্রসাধন করে আর সবাইকে তাই করিয়ে কেবল টাকা জমিয়েছিলেন। তা হি হি হি—সঙ্গে করে নিয়ে যাবার তো উপায় হয়নি—

পরমেশ্বরও হেসে উঠে বলে, ও। তাহলে তুমি এই স্বপ্ন দেখেই এখানে আসার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছিলে ? ওই আনন্দেই থাকো। পঞ্চাশ বছর ধরে একটা পোড়োবাড়িতে রাশিরাশি টাকারা আনটাচড্ রয়ে গেছে ?

আহা, তার জন্যে তো গোড়া থেকেই প্রতিষেধক 'ডাইনির বাসা'। আর মাপেও তো প্রায় একখানা 'কফিনের' মতোই, লোকে ভয় পেয়ে আর

হাত দিতে আসেনি।

হুঁঃ। চোর ডাকাতের আবার ডাইনির ভয়।

তবু বন্ধ পড়ে আছে তো দেখছো। মাকড়সার জাল সামান্য দিনের নয়। যাক গে -খুলিয়ে তো ছাড়বোই, তখন দেখা যাবে বাবা, এখন হাত মুখ ধুয়ে নিন তো। খেতে বসুন। তবে খুবই লজ্জিত বাবা, এই গরমে আপনাকে বর্ষার দিনের খাদ্য খেতে দিতে হচ্ছে।

লজ্জিত !

লালু এসে আহারের আয়োজন দেখে আর একবার স্তম্ভিত স্তব্ধ।

আসনের বদলে দুখানা খবরের কাগজ বিছোনো তার সামনে বড় বড় কলাপাতায় খিচুড়ি বেগুনী সামনে আচার চাটনির শিশি।

উচ্ছ্বসিত হতে গিয়ে হঠাৎ প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে পড়েন লালু, বৌমা। তুমি কী ম্যাজিক জানো ? এ কী ?

আমি কেউ নয় বাবা। সব ক্রেডিট রমার মার।

লালু অবশ্য সেকথায় গুরুত্ব দেন না। খেতে বসে ছেলের দিকে তাকিয়ে গভীর গলায় বলেন, কী মনে হচ্ছে, জানিস পরম, যেন সেই ছেলেবেলায় ফিরে গেছি। মনে পড়ে যাচ্ছে -খিচুড়ি হলেই মা কলাপাতায় খেতে দিতেন। বলতেন কলাপাতায় খেলে যেন বেশ ভোগের প্রসাদের মতো লাগে। মাছটাছের তো পাট ছিল না। এই দালান, এইখানে বসা হতো ! দাদু অবশ্য আলাদা বসতেন ওদিকে আরো ঘরটর ছিল। খেতে বসে 'মৌনী' থাকতেন কিনা। অন্যের সঙ্গে বসে যদি কথা কয়ে ফেলেন। কী আশ্চর্য দ্যাখ। এসব কথা কোনোদিনও মনে পড়েনি, অথচ এখানে এসে —তো বৌমা তোমার কই ?

আপনারা খান না। আমি আর রমার মা পরে খাচ্ছি।

পরমেশ্বর ভুরু কোঁচকায়। ইংরিজিতে বলে রমার মার সঙ্গে এক টেবিলে ?

সর্বোত্তমা সেই প্রণালীতেই উত্তর দেয়, টেবিল নয় বলেই তো সুবিধে। মাটিতে সকলের আসন পাতা চলে। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেওয়া যায়। আবার ফুট কয়েক দূরে বসিয়ে, তোমাদের আভি-জাত্যটিও বজায় রাখা যায়। বেচারি এতো খাটলো, খুব খিদেও পেয়েছে নিশ্চয়, ওকে ফেলে খেয়ে নেব ?

লালু হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলে গভীর গলায় বলেন, পরম, একটা দামী জিনিস পেয়েছিস, তার মূল্য বুঝতে শিখিস।..... আমরা বড় হতভাগা রে, মাকে কোনোদিন বুঝতে চেষ্টা করিনি। ভেবে দেখিনি কী বঞ্চিত জীবন ছিল। অতি শৈশবের স্মৃতিতেও মনে পড়ে সাদা থান পরা মা। অথচ কী বা বয়েস ছিল তখন মার।

আপনার বাবাকে আপনার মনে পড়ে না?

বিশেষ না। হঠাৎ এক একদিন কে যেন আসে, আমাদের একটু আদর করে, আবার ফুট করে চলে যায়। তা সে আর ক'দিনই বা দেখেছি? .. পরে দেখেছি মামা সরু পাড় দেওয়া কাপড় এনে পরার জন্যে জোর করছে, মাকে পেরে ওঠেনি। মাকে হেসে বলতে শুনেছি, কী যে বল দাদা। ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা যায়?

আরে বাবা, এখানে তোর শ্বশুরবাড়ির কেউ দেখতে আসছে? মহাত্মা ত্রিভুবনেশ্বর তো তোকে ছুটি দিয়ে গেছেন। তা মা বলতো, কেউ দেখার কথা কে ভাবছে দাদা? নিজেকে নিজে দেখতে হবে না?

বুড়ো ভদ্রলোক বিশেষ সুবিধের ছিলেন বলে মনে হয় না। মানে তোমার ঠাকুর্দা বুড়ো!

লালু হেসে ওঠেন, আমাদেরও কোনোদিন মনে হয়নি। তাই এই বাড়িটা সম্পর্কেও যেন মনে বিরুদ্ধ ভাব কাজ করতো। অথচ এখন—

কী হলো? থেমে গেলেন?

না; সে শুনলে পুত্ররত্ন হয়তো গায়ে ধুলো দিতে চাইবে।

পরমেশ্বর পাত চেটেপুটে খেতে খেতে বলে, পুত্ররত্নটি আবার এর মধ্যে আসছে কী সূত্রে?

মানে শুনলে হাসবি নিশ্চয়। মনে হচ্ছে বাড়ির এ অংশটা যা আছে সারিয়েটারিয়ে যেন থাকা যায়। বিক্রী করে না ফেলে, তেমন করতে পারলে মাঝে মাঝে বেশ বেড়াতে আসা যায়।

বলেন এ কথা লালু। কারণ এখন তিনি পাঁচ খোপের ঘরটার জানলা দরজা খোলা খোপটায় এসে গিয়েছেন।

পরমেশ্বর হেসে উঠে বলে, এই চিন্তা মনে হচ্ছে তোমার? তাহলে বাবা তোমার আশঙ্কাই থাক। হেসে ওঠা ছাড়া—

সর্বোত্তমা এদের কথার মাঝখানে বেশ আত্মস্থ হয়ে বলে, বাবা, শুধু ভাবছেন? আমি তো স্থির করে ফেলেছি। বাড়িটাকে

সারিয়ে দরকার মতো করে নিয়ে উঠোনে একটা টিউবওয়েল বসিয়ে, বাস-যোগ্য করে নিতে হবে। এখানে তো আলোও এসে গেছে দেখলাম।

চমৎকার।

পরমেশ্বর ব্যঙ্গের গলায় বলে ওঠে, তাহলে মেনেই নিতে হবে সত্যিই বাড়িটায় কোনোখানে 'ডাইনির বাসাটাসা' কিছু আছে। তাই এখানে এলেই যতো অ্যাবসার্ড চিন্তা মাথায় খেলতে থাকে।

পড়ন্ত বিকেল। দিনের সে উত্তাপ আর নেই, গরমের বিকেলের বিশেষ একটি মাদকতাময় বাতাস আছে। সেই বাতাসে কী যেন ফোটা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। ধরা যাচ্ছে না কোন ফুল, অথচ যেন চেনা চেনা।

সর্বোত্তমা সেই 'সিন্দুকের ঘরের' মধ্যে এসে জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে। যেখান থেকে ধর্মেশ্বরের শিবের মন্দিরের চুড়োয় গাঁথা ত্রিশূলটা দেখতে পাওয়া যায়। হাওয়ার ঝাপটা আসছে মাঝে মাঝে, সর্বোত্তমার খোলা চুলগুলোকে উড়িয়ে এলোমেলো করে দিচ্ছে। সর্বোত্তমার হাতে একটা মোটা চিরুনি।

এখন আর সর্বোত্তমা তার সেই পরম কৌতূহলের জিনিসটার দিকে তাকাচ্ছে না। দেখাও যাচ্ছে না যেন। ঘরের ওই কোণের দিকে ছায়া নেমেছে, তার সঙ্গে কড়িকাঠ থেকে নেমে আসা লম্বা লম্বা ঝুল আর ঘন বুনন মাকড়সার জালে, কোণটা যেন একটা ভয়ের থাবার মতো ঘাপটি মেরে বসে আছে। অথচ সারা ঘরটা বেশ পরিষ্কার।

রমার মা বলেছে, আগামীকাল চান-এর আগে সে ওই ঝুল ময়লা সাফ করে ফেলবে। একটু আগে চিরুনিখানা চুলে বুলোতে বুলোতে এঘরে এসেছিল সর্বোত্তমা, তখন দিনের আলোটা স্পষ্ট ছিল, রমার মা চলে গেছে অন্য কাজে। এখন পড়ন্ত বিকেল ক্রমেই সন্ধ্যের দিকে এগোচ্ছে। সর্বোত্তমা তাই জানলার কাছে এগিয়ে গেছে। হঠাৎ যেন একটা গা ছমছমে ভাব লাগছে। ও ধারের দেওয়ালেও দুটো জানলা আছে, তবে খুললে শুধু খানিকটা জঞ্জাল জমি আর গোয়াল বা রান্না-ঘর ভেঙে পড়ে যাওয়া ভাঙা ইঁটের স্তূপ।

এ জানলার সামনেটা খোলা মাঠ। দূরে মন্দিরচুড়োয় ত্রিশূল।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে যায় সর্বোত্তমা। নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে, ভুলে যায় কী করবার রয়েছে তার। যেন

ওই এলোমেলো বাতাসটার ঝাপট খেয়ে চলাই তার এখন একমাত্র কাজ।

বাইরে একটা মজুর এসেছিল, তার সঙ্গে কথাবার্তা কইছিলেন লালু, উঠোনটা একটু সাফ করার প্রস্তাব দিয়ে। আর শুনতে শুনতে অসহিষ্ণু পরমেশ্বর বারে বারেই বাধা দিতে চেষ্টা করছিল কী লাভ বাবা? সত্যিই তো আর আমরা থাকতে আসিনি। আমাকে তো পর্শু চলে যেতে হবেই।

অতঃপর বেজার হয়ে দালানে উঠে ঘরে উঠে এল। বৌকে খুঁজতে। এঘর ওঘর দুটো ঘরই ফাঁকা। অবশ্য ফাঁকা বললে ভুল হবে, সর্বোত্তমা আর রমার মার যুগ্ম প্রচেষ্টায় এনে ফেলা জিনিসপত্রের স্তূপ এখানে ওখানে। ঘরগুলোকে এখন আর অবাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। শুধু মেঝেটায় বড় বড় ফাটলের রেখায় খানিকটা অসৌন্দর্য এনে দিয়েছে।

চলে এল এঘরে।

দেখল বৌ জানলার ধারে দাঁড়িয়ে, পিঠের ওপর ছড়ানো খোলা চুল। একটা ছায়ামূর্তির মতো দেখতে লাগছে।

কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিছুক্ষণ, টের পেল না সর্বোত্তমা। আস্তে তার কাঁধটা ছুঁলো। আর ছোঁওয়া মাত্রই অস্ফুট কী একটা শব্দ করে ভয়ানক চমকে উঠে ফিরে দাঁড়াল সর্বোত্তমা। তারপর আস্তে বলল, ওঃ। তুমি? হঠাৎ এমন ভয় লাগিয়ে দিলে! ডাকবে তো?

ডাকবো কী! তুমি যা ধ্যানমগ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলে।

সর্বোত্তমা তেমনিআচ্ছন্ন ভাবে বলে দেখো এই জানলাটায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছিল, যেন আগে আরো অনেক অনেক দিন এইভাবে ওই ত্রিশূলটার দিকে তাকিয়ে থেকেছি। আর তখনও এই ঘরটায় এলেই এইরকম গা ছমছম করতো।

ওই হলো?

পরমেশ্বর বিব্রত এবং বিরক্তভাবে বলে, এই এক অদ্ভুত কাব্যিক রোগ তোমার। বরাবরই তুমি বলতে, জন্মে কখনো নাকি দার্জিলিং যাওনি। তোমার বাবা তোমাদের বার তিনেক কাশ্মীর দেখিয়েছেন, মুসৌরি কুলু মানালি দেখিয়েছেন, অথচ হাতের কাছে দার্জিলিঙে নয়। কেন? না বোধহয় হাতের কাছে বলেই। কাজেই বিয়ের পর হানিমুনের জন্যে দার্জিলিংটাই বেছে নিয়েছিলে। অথচ গিয়ে হঠাৎ বলে উঠলে, দেখো, মনে হচ্ছে আগে যেন এ সবই দেখেছি। যেখানেই যাই, বলতে

থাকো এ সবই তোমার আগে দেখা। স্রেফ কাব্যি! নিজেকে অন্য একরকম কিছু ভাবতে ভালবাসো।

অন্য সময় হলে বরের এ ধরনের কথায় সর্বোত্তমা কী উত্তর দিতো কে জানে, তবে নিশ্চয়ই নিরীহ উত্তর নয়। ঠিকরে উঠে রীতিমতো ধারালো উত্তরই দিতো নিশ্চয়। কিন্তু এখন কেমন আলগা ভাবে বলে, আমি কী ইচ্ছে করে বলছি? যা মনে হচ্ছে তাই বলছি। মনে হচ্ছে. এই দেয়ালটার কাছে মস্ত একটা বিছানা পাতা থাকতো উঁচু পালঙ্কে কী চৌকিতে, আর সেটা দেখলেই ভয়ে আমার গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যেতো। মনে হতো যেন ভয়ংকর একটা বাঘ দাঁত খিঁচিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। একটা না অনেকগুলো, কে জানে!

পরমেশ্বর বাঘমুখো পায়া চৌকি চোক্ষেও দেখেনি, বাবা-কাকার গল্পের মধ্য থেকে আবিষ্কার করেনি কাজেই রাগ করে বলে, হঠাৎ হঠাৎ তোমার কী হয় বলো তো? তুমি যে ইউনিভার্সিটির একটা ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্রী, ইকনমিকস নিয়ে রিসার্চ করছো, এসব যেন মনেই থাকে না। মনে হয় যেন রমার মাদের 'কালচারে' গিয়ে হাজির হয়েছ। এই এক পচা গ্রামে এসে—ধ্যাৎ! আমি তো পর্শু যাচ্ছি, তুমি আবার বলে বসবে না তো 'আমি কী জন্যে এক্ষুণি ফিরবো, আমার তো আর অফিস নেই।'

কথা বলতে বলতে ওরা এঘরে চলে এসেছে। সর্বোত্তমার চোখে পড়ে স্যুটকেস খুলে রেখে গিয়েছিল, সন্ধ্যাবেলা নারায়ণ-ঘরে আরতি দেখতে যাবে বলে শাড়ি বাছতে। সর্বোত্তমা নিজের ধাতে ফিরে আসে। একটু হেসে বলে ওঠে, সেটা বলব কিনা গ্যারাণ্টি দিতে পারছি না।

ঠিক আছে। সবটাই আমার বাজে লাগছে।

আর কিছু কথা হবার আগেই দেখা গেল মোহন-কন্যা ঝর্ণা আরো গুটি তিনেক অপোগণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কী ব্যাপার!

বাবা বলে পাঠাল পুন্নিমে থাকতে থাকতে আরতিতে বসবে। আপনারা একটু সকাল সকাল চলেন।

পরমেশ্বর এগিয়ে এসে বলে, তো সেই 'পুন্নিমে'টি কতক্ষণ থাকছে?

আপনারা জানেন না?

বাঃ, আমরা কী করে জানবো ?

পাঁজি দেখেন নাই ? এত লেখাপড়া জানেন।

সর্বোত্তমা ওর বিস্ময় দেখে হেসে ফেলে বলে, পাঁজিটা আনা হয়নি ভাই। তুমি জানো ?

হুঁ। বাবাকে হম্বিতম্বি করতে শুনছিলুম মায়ের কাছে, সন্ধ্যা সাড়ে ছটার পরেই পূর্ণিমে ছেড়ে যাবে, তাড়াতাড়ি পুজোর গোছগাছ দিয়ে দাও।

ওঃ ঠিক আছে। যাচ্ছি। তো ওই নারায়ণের মন্দিরটি কোথায় ?

ঝর্ণা গিন্নীর মতো গালে হাত দিয়ে বলে ওঠে, ও মা। তাও জানেন না ? উই তো ওই ভাঙা কুয়োটার ধার দিয়ে একটু গেলেই ঝাঁকড়া পাকুড় গাছটার পেছনে। খোয়া খোন্দল রাস্তা। তো মন্দির তো না, ঘর।

ঘর।

হ্যাঁ, ঘরই তো ! ঠাকুরের একখানা বড় ঘর, আর পাশে একখানা ভোগ রাঁধবার ছোট্ট ঘর। এ বাদে চাতাল দালান আর ঠাকুরের নিজস্ব কুয়ো।

সেসব ভেঙে যায়নি ?

নাঃ, খুব ঠিক আছে।

মেয়েটা বলে ওঠে, শুনেছি আমাদের ঠাকুর্দা থাকতে, পেরায় মেরামত করতো। আর বাবাও কলকেতায় গিয়ে আপনাদের ঠাকুমার কাছ থেকে টাকা এনে এনে দুবার কলি ফিরিয়েছে।

হঠাৎ ফিক করে একটু হেসে ফেলে বলে সেই সঙ্গে আমাদের রান্নাঘরখানাও পাকা করে নিয়েছিল। মাটির ছিল তো !

সর্বোত্তমা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটায়, এরা কারা ? তোমার ভাইবোন ?

হুঁ। এই ছোটটা হচ্ছে অসভ্যর রাজা। বললুম, একটা জামা গায়ে দিয়ে চল। দিল না। শুধু ইজের পরে চলে এসেছে। বলে কী গরম হচ্ছে ! আচ্ছা যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি আসবেন।

সর্বোত্তমা তাড়াতাড়ি চুলটা ঠিক করে নেয়, রমার মায়ের আনা জল নিয়ে একটা ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে চলে যায় গা ধুতে। যাবার সময় বলে, আচ্ছা বাবা কোথায় ?

পরমেশ্বর অবলীলায় বলে, বাবার এখানে এসে পাখা উঠেছে।

ওপরওলা সঙ্গে নেই কি না। একটা মজুরের সঙ্গে বকবক করছিলেন, আমায় বলে রেখেছিলেন একটু ঘুরে ফিরে ঠিক সময় ওই পুজোর জায়গাতেই এসে জুটবেন।

সর্বোত্তমা একটু হেসে বলে, তোমার হয়েছে মুশকিল, কী বল? সর্বদা চোখের সামনে 'ওপরওলা'।

কারেক্ট। কিন্তু স্নানের জলটা পাচ্ছি কোথায়? স্নান না করে তো—

নো চিন্তা। ওই ওদিকের পাঁচিলটার আড়ালে বাবা দুপুরেই একটা মজুরকে দিয়ে দু তিনটে ক্যানেস্তারা ভর্তি করে জল আনিয়ে রেখেছেন? দেখো গে। মগও আছে। সাবান তোয়ালে নিয়ে যেও।

তারপরে একটু হেসে বলে, একসময় নাকি শাস্ত্রের নির্দেশ ছিল, 'পথি নারী বিবর্জিতা!' কারণ তাদের নিয়ে অনেক ঝঞ্ঝাট। আমি তো দেখি এখন ঠিক উল্টো। বাইরে গেলে বাপী তো মাকে এক মিনিট না দেখতে পেলে চোখে অন্ধকার দেখেন। নিজের জিনিসপত্র কিছু খুঁজে পান না। আর সবসময় বলেন, 'এটা আনোনি? অ্যাঁ, ওটা আনোনি অ্যাঁ।' বাপীর ঠিক কোন কোন বইগুলো সঙ্গে নেওয়া খুব জরুরী, তাও মাকে বুঝে ঠিক করতে হবে। অথচ অনবরত বলতে থাকবেন, 'উঃ! তোমরা মেয়েরা এত বোঝা বাড়াতে পারো। হালকা হতে শিখলে না। বাইরে বেরোতে হয় হালকা হয়ে।'

হাসতে হাসতে চলে যায়। তারও কাঁধে তোয়ালে, হাতে সাবানদানি।

এখন পরমেশ্বর তাকিয়ে দেখে। নাঃ। সেই তখনকার ভাব আর নেই। ঠিক সহজ।

দূর। ওই ভূতুড়ে ঘরটায় না যাওয়াই ভালো।

আশ্চর্য! সবকিছু 'কুসংস্কার বলে হ্যানস্থা করলেও, নিজের মধ্যেও কুসংস্কারের শিকড় গাড়া থাকে তা' মানতে চায় না এ যুগের এরা। কিন্তু ওই 'কুসংস্কার' নামক ভয়ংকর একটি অদৃশ্য শক্তি ঠিক আপন মনে কাজ করে চলে। সর্বত্র। সকলের ওপর।

ধূপের গন্ধে ধুনোর গন্ধে, ফুলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত।

মোহন গভীর আপ্লুত গলায় বলে, নারায়ণের, কী খেলা দেখুন। আজ আপনারা এলেন, আর আজকেই চৈতিপূর্ণিমা পড়েছে। বিগ্রহের

বিশেষ ভোগরাগ আরতি। সবই তাঁর ইচ্ছে।

কিন্তু বিগ্রহ কই? মূর্তি?

সর্বোত্তমা হতাশ গলায় বলে ওঠে, মূর্তি নেই?

মূর্তি? কই না তো? পুরুষানুক্রমে তো এই শালগ্রাম শিলাই পুজো হয়ে আসছে। শুনেছি আগে নাকি বাড়ির মধ্যেই লক্ষ্মীর ঘরেই শিলা বিগ্রহও থাকতেন। তো কী জন্যে যেন পরে বুড়ো কর্তামশাই এই ঘরটর বানিয়ে নারায়ণকে ভিটে বাড়ি থেকে সরিয়ে এনে আলাদা প্রতিষ্ঠা করেন।

সর্বোত্তমা হঠাৎ বলে ওঠে, আচ্ছা আমি যদি এখানে একটি সুন্দর মূর্তি রাখতে চাই? রাখতে দেবেন?

মূর্তি! মোহন একটু অসহায়ভাবে বোকার মতো এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, মানে পেতলের? না পাথরের? না অষ্টধাতুর?

তা তো জানি না। ও বাবা, আপনিই বলুননা।

লালু আস্তে বলে, পাগলি মেয়ে! এক্ষুণি কী বলা যায়? বাড়ি ফিরে ভেবে চিন্তে দেখে—

পরমেশ্বর ব্যঙ্গের গলায় বলে, তোমার বৌমাটি তো মনে হচ্ছে ঠিক করে ফেলেছেন, এইখানেই বসবাস করবেন। তো বোধহয় মন্দিরের সেবিকাটেবিকা হয়ে। যা দেখছি—

আরও কিছু বলতো হয়তো, আরতির ঘণ্টা বেজে ওঠে।

দুটো লম্বা লম্বা পিতলের পিলসুজের ওপর দুটো বড় বড় পেতলের প্রদীপ তার ছায়া কাঁপছে, ঘরের মধ্যে আলো আঁধারি।

মোহন ভটচায্যির আরতির ছন্দ আর ভঙ্গী শেষ হতে চায় না। ··মোহন গৃহিণী একগলা ঘোমটা দিয়ে দেয়াল ধারে বসে মাঝে মাঝে শাঁখ বাজাচ্ছেন। ঝর্ণার ছোটো ভাইটা কাঁসরে কাঠ পেটে, আর ঝর্ণা ধুনোয় বাতাস দিয়ে দিয়ে ঘরে ধুম্র জালের সৃষ্টি করে। তার মধ্যে থেকেই তাকিয়ে দেখতে দেখতে ক্ষুণ্ণ হয় সর্বোত্তমা, পিলসুজগুলো অত কালো কেন? মনে হচ্ছে যেন লোহার। জীবনে মাজা হয়না নাকি? ····ঘণ্টা কাঁসর পঞ্চপ্রদীপ সবই যেন কলঙ্ক ধরা! নৈবেদ্যর থালাও তাই।

কী আশ্চর্য! ঠাকুরের জিনিস! পরিষ্কার রাখতে হয়তো! ..

হঠাৎ মনে হয়, কিন্তু ভটচায্যির সেই মেয়েটা কই? সেই 'সারের

সার প্রথম সন্তান।' কুঁচোকাঁচাগুলো তো সবাই রয়েছে, স্বয়ং গৃহিণীও। সেই মেয়েটাকে কী বাড়ি আগলাতে রেখে এসেছে।

আরতির মাঝখানেই হঠাৎ গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে ওঠে, হঠাৎ হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে।

এইরে বৃষ্টি আসবে না তো!

মোহন ঘণ্টাপর্ব শেষ করে ময়লাধরা পেতলের থালায় কিছু মিষ্টি আর বাতাসা রেখে নিবেদন করে এগিয়ে ধরে এদিকে।

দেখে মনটা ভারী সংকুচিত হয়ে ওঠে সর্বোত্তমার। ইস থালাটা কী ময়লা।

ফুলের থালাটাও তেমনি।

ঠাকুরের সিংহাসনটি? সেও পেতল কী লোহা তা বোঝবার উপায় নেই!

এত সুন্দর ফুল মালা ধূপ ধুনো অথচ বাসনগুলো?

ওদের যে জীবনে কখনো মাজা হয়, এমন মনে হচ্ছে না।

কিন্তু সর্বোত্তমার এ ধারণা খুব ঠিক নয়। জীবনে কখনো মাজা হোক বা না হোক আজ মোহন ভটচায্যি তার গিন্নীর ঘাড় ধরে এসব মাজিয়েছে। তবে পেতল তামা এরা রীতিমতো অভিমানী, নিত্যসেবা ব্যতীত ওরা হাসিমুখে তাকায় না।

আরতি শেষ হতেই হরির লুট পড়ল। আর দেখা গেল মোহন বাহিনীর হুমড়ে পড়ে কাড়াকাড়ির এক কুদৃশ্য। ক'খানা বাতাসার জন্যে ওরা ভাইবোনের মধ্যে এমন মরণ কামড় লড়াই করছে!

মোহন বললেন, প্রসাদটা আপনারা নিয়ে যান দাদা।

লালু বললেন, থাক! থাক! প্রসাদ কণিকামাত্র হলেও চলে। ওসব ছেলেপুলের জন্যে। আপনি নিয়ে যান।

হঠাৎ ভয়ঙ্কর জোরে মেঘ ডেকে উঠল, কড়কড় করে। একটা শব্দ উঠল শোঁ শোঁ করে, অর্থাৎ গাছপালার মাতামাতি।

এইরে মোহন চেঁচিয়ে ওঠে, কালবৈশেখী ঝড় উঠল দাদা। যান যান মা লক্ষ্মীকে নিয়ে বাড়ি চলে যান। জোরে বিষ্টি নামতে পারে।

লালু বললেন, পরম তুই ছুটে চলে যা বৌমাকে নিয়ে আমি ভটচায্যির সঙ্গে একটু কথা সেরে যাচ্ছি। দেখগে বাবা রমার মা-টা একা

রয়েছে। এগিয়ে পড় এগিয়ে পড়। খুব সাবধান।

বেরিয়ে পড়ে দেখে আকাশের চেহারার কী আমূল বদল ঘটে গেছে। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধারা অন্তর্হিত, আকাশটা যেন লালচে ধুলোয় ভরে উঠেছে।

পরমেশ্বর বলে, সেরেছে।

খটখট মড়মড় শোঁ শোঁ শনশন নানারকম শব্দ। বৃক্ষলতাদের তাণ্ডব নৃত্যধ্বনি।

সর্বোত্তমার মধ্যেও যেন একটা উল্লাসের তাণ্ডব নৃত্যের নূপুরধ্বনি! হাত বাড়িয়ে পরমেশ্বরের একটা হাত চেপে ধরে বলে ওঠে, এই দেখছো, দেখছো! কী সুন্দর।—ইস্। এই আমি কিন্তু গান গাইছি—

বলেই ঝড়ের শব্দের মধ্যেই গেয়ে ওঠে—

'বীণাতন্ত্রে হানো হানো খরতর ঝংকার —ঝঞ্ঝনা

তোলো উচ্চসুর—

হৃদয় নির্দয়াঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝড়িয়া পড়ুক প্রবল প্রচুর।

গাও গান প্রাণ ভরা—ঝড়ের মতন উর্ধ্ববেগে

অনন্ত আকাশে —! উড়ে যাক দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ পাতা —'

আঃ! উত্তমা! কী হচ্ছে? পাগলামি রাখো। তাড়াতাড়ি এসো। দেখছো কী ভীষণ বৃষ্টি আসছে—

আরে! সেই জন্যেই তো! আর কক্ষনো কী এমন—

ঝড়ের শব্দে শোনা যাচ্ছে না, তবু সর্বোত্তমা গলা তোলার চেষ্টা করে,

'ওই আসে, ওই অতি ভৈরব হরষে—

জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে—

ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা—

শ্যাম গম্ভীর সরসা—'

হঠাৎ একান্ত কাছ থেকে একটি চাঁচাছোলা গলার স্বর ধ্বনিত হয়, বাঃ। চমৎকার! কিন্তু ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? ওদিকে তো বাঁশ-ঝাড়!

গলাটা ধারালো, তবু যেন সুরেলা!

সর্বোত্তমা পরমেশ্বর দুজনেই একসঙ্গে চমকে উঠে বলে, কে?

কেউ না। কিন্তু ওদিকে আর এগোলে রক্ষে নেই।

আপনি কে ?

বললুম তো, কেউ না। তবে ভয় নেই, ভূত নয়।

সর্বোত্তমা ঝড়ের দাপট থেকে আঁচল সামলাতে সামলাতে বলে, কোনদিকে যাবো তবে ?

আঁচল সামলাতে গিয়ে পরমেশ্বরের হাতটা হাত থেকে ছেড়ে যায়।

এই আমার সঙ্গে—এদিকে —

ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের চমক। সেই আলোতে চোখে পড়ে যেন একটি চলন্ত বিদ্যুৎশিখা।

আমি তো আপনার 'দিকটিক' বুঝতে পারছি না।

কোথায় একটা গাছ ভেঙে পড়ে।…তার ভয়ংকর শব্দটা কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন করে দেয়। পরমেশ্বর চেঁচিয়ে ওঠে, উত্তমা। আমি এদিকে—

আলো, আঁধারির অস্পষ্টতার মধ্যে সেই ধারালো আর সুরেলা গলাটা আবার ঝলসে ওঠে, কিন্তু ভুল দিকে! গিন্নীকে ওদিকে টানবেন না।……এই যে বৌদি, আমার হাতটা ধরুন।… হি হি হি ভয় নেই। ভূত পেত্নীর হাত ধরা যায় না!…

বলে নিজেই সে ঝড়ের দাপটের মধ্যেও শাড়ি সামলে এগিয়ে এসে সর্বোত্তমার একখানা হাত চেপে ধরে বলে, এই যে এ পাশ ঘেঁষে। সাবধান। হোঁচট খাবেন না, পায়ের কাছে ইঁটের ঢিপি। হ্যাঁ, এই দিকে—সাবধানে —

বলেই আবার হেসে উঠে বলে, আপনিও সরে এসে গিন্নীর আঁচলটা চেপে ধরুন। ঢিপিটা পার হতে পারলেই —

আঁচল অবশ্য ধরে না পরমেশ্বর। তবে সর্বোত্তমার খুব নিকটে সরে আসে। আর মনের আগোচর কিছু নেই, তাই অতি আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক এই তরুণ যুবকটিকে হঠাৎ যেন একটা বিজাতীয় ভয় গ্রাস করে বসে। এ কী বাবা। 'কে' এ ? অথবা 'কী' ? কি জানি বাবা পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার! সাতকালের পোড়ো বাড়ি, বুনো জঙ্গুলে পরিবেশ!…হঠাৎ সর্বোত্তমার হাতটা চেপে ধরলো কেন? তাছাড়া হঠাৎ এখানে উদয় হলোই বা কোথা থেকে ?…এই দুর্দান্ত দুরন্ত ঝোড়ো হাওয়া, এর মধ্যে আবার সর্বোত্তমার গলা ছেড়ে গান গাইতেও ইচ্ছে করলো!…উঃ! শালা পুরুতটা যে কী দেরিই করিয়ে দিলো!

মনে মনে কাকে কী না বলা যায়! তাই সভ্য ভদ্র ছেলেটা অনায়াসেই

বলে, শালার আরতি আর শেষ হয় না। যেন বারোয়ারি তলার দুর্গার আরতি পেয়েছে।....সেখানেও ধৈর্য থাকে না।

মনে মনে কথা বলে চললেও কানটা সাধ্যমতো খাড়া রাখে, হ্যাঁ। ঠিক আসছেন। পায়ে চটিটা আছে? না ঝড়ে উড়ে গেছে?....বুড়ো আঙ্গুলটি সাবধান। হোঁচট খাবেন না। মরণ ফাঁদ হয়ে আছে।

হঠাৎ ঝড়ের শব্দটা একটু প্রশমিত হয়।

কোনদিক থেকে একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস আসে। বৃষ্টি শুরু হলেই ঝড়ের রুদ্র রূপটা কমবে। ·মাঠের ওদিকে বোধহয় বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ··ধেয়ে ধেয়ে এদিকেও এসে যাবে।

কিন্তু ততক্ষণে পথেরও সমাপ্তি।

এসে পড়েছে এরা নিজেদের বাড়িতে। উঠে পড়লো দাওয়ার ওপর। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের লীলা অবশ্য চলেই চলছে।

এ কথা অবশ্য বলা হয়ে আছে 'ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার, পথিকের নয়ন বাঁধিতে।'

তবু ক্ষণপ্রভাকে পুরোপুরি 'আসামী'র ভূমিকায় ফেলা যায় না। ওই ক্ষণে ক্ষণে এক একটু প্রভা দান করেও পথিকের কিছুটা সুসার করে। বিদ্যুতের চমকেই তো বাড়িটাকে দেখতে পাওয়া গেল। ভাঙা ভাঙা পৈঠে ডিঙিয়ে দাওয়াতেও উঠে আসা গেল।

উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তো ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি এসে গেল। প্রথমটা দিকবিদিকহীন এলোমেলো, তারপর মুষলধারে। যার 'ছাটটা' অন্যদিকে। তা বলে রোয়াকে কী আর একেবারে আসছে না!

সর্বোত্তমা বলে ওঠে, এ কী! আপনি নেমে যাচ্ছেন মানে। পাগল না কী? আমাদের বাঁচিয়ে দিয়ে এখন—

তা এহেন সময় মাথা বাঁচানো ছাউনি থেকে পথে নেমে পড়াটা পাগলেরই কাজ। এবং মেয়েটা হেসে উঠে বলে, দেখে কী 'পাগল' নয় বলে মনে হচ্ছে? অবশ্য 'পেতনী' 'শাঁখচুন্নি' ভেবে থাকেন তো আলাদা! যাক দাঁড়াতেই হলো। মাথা বাঁচানোটা সবচেয়ে জরুরি।

সর্বোত্তমা দাওয়ার ওপরকার বন্ধ দরজাটার কাছে গিয়ে ডাক দেয়, রমার মা। রমার মা!

দালানের ভিতরে চারিদিক জম্পেশ করে বন্ধ করে একটা হ্যারিকেন

জ্বালিয়ে রমার মা সেই কোনকাল থেকে 'দুর্গা কালী, নারায়ণ, মধুসূদন, রাম রাম' ইত্যাদি করে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর নাম জপ করে চলেছিল, এবং প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করছিল ছাদটা হুড়মুড়িয়ে তার মাথার ওপর নেমে এলো বলে।

এখন এই কণ্ঠস্বর তার কাছে তেত্রিশ কোটির অভয় বাণীর থেকেও 'পরমপ্রাপ্তি মনে হলো। তবু খিল খোলবার আগে বলে উঠলো, বৌদিদিরা এলে না কী!

এলাম।

আস্তে খিল খুলে ধরলো একহাতে হ্যারিকেনটা উঁচিয়ে ধরে।

আগেই পরমেশ্বর এগিয়ে গেল, কী অবস্থা? ছাতটাত ভেঙে পড়েনি তো?

না দাদাবাবু। ঠাকুরের দয়ায় তো পড়ে নাই। আসেন ভেতরে আসেন, বিষ্টির ছাঁটে ভিজে যাচ্ছেন যে—। ইনি? হ্যাঁ গো বৌদিদি?

ইনি? আমিও এখনো জানি না ইনি কে? আসুন। বলে সেই অজান্যাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে চারদিক তাকিয়ে দেখে সর্বোত্তমা। কই জলটল তো পড়েনি।

রমার মা ওদের দেখেই দালানের ভিতরদিকে ঘরের মধ্যে একখানা শতরঞ্জ বিছিয়ে দিয়েছে। এবং হ্যারিকেনের শিখাটা যতোটা সম্ভব বাড়িয়ে দিয়ে কাছে বসিয়েছে। তারপর প্রায় ডুকরে ওঠার মতো করেই বলে ওঠে, তোমাদের দেখে ধড়ে প্রাণ এলো গো! অ্যাতোক্ষণ যে প্রাণের মধ্যে কী হচ্ছেলো। শখ করে খুব জায়গায় বেড়াতে আসা। তো চা খাবে তো?

চা।

সর্বোত্তমা বলে ওঠে,—এই অবস্থার মধ্যে তুমি চা বানাতে পারবে?

তা আবার পারব না কেন? ছাতখানা যখন ভেঙে পড়েনি, আর ছাত ফুঁড়ে জলও পড়েনি তখন আর অসুবিধা কী? সব তো রেডি করাই আছে। তিন কাপ আনবো তো?

প্রশ্নের উত্তরটা না নিয়েই অবশ্য রমার মা চলে যায়।

এখন হ্যারিকেনের আলোয় দেখা যায় সেই রহস্যময়ীকে। নেহাৎ মোটাসোটা একখানা তাঁতের ডুরে শাড়ি আঁটসাট করে পরা, গায়েও

তেমনি ব্লাউস। তবু চেহারাটি দেখবার মতো। তুলনা করতে হলে উপমা খুঁজতে হবে।

রমার মা ভিতর ঘরে চলে যেতেই হেসে উঠে বলে, ঝড়ের তাণ্ডবের মধ্যেও গান গেয়ে ওঁর উৎস খুঁজে পাচ্ছি। এমন একখানি 'সম্পদ' ঘরে মজুত রয়েছে। আমি তো 'চা' শুনে চমকেই উঠেছিলাম। একে তো এই পোড়োবাড়ি, তায় –

পরমেশ্বর বলে ওঠে, আমরা কিন্তু—

আমায় চিনতে পারছেন না। এই তো ? ওটা ক্রমশ প্রকাশ্য ! কিন্তু নারায়ণের ঘরে গিয়ে বেশ একখানা 'নাটক' দেখলেন তো ?

নাটক !

নাটক ছাড়া আর কী ! কত কাল পরে অভাগা নারায়ণের কপাল ফিরল ! সন্ধ্যা আরতি ! আহা ! নারায়ণ বেচারী তো বুড়ো কত্তা গত· হওয়া ইস্তক ও জিনিসের নামই ভুলে গেছলো।

সর্বোত্তমা চমকে উঠে বলে, কেন ? সন্ধ্যা আরতি হয় না ?

ক্ষেপেছেন ? সাত জন্মে সন্ধ্যাবেলায় নারায়ণের ঘরের তালাচাবিই খোলা হয় না। দৈনিক একবারই তালা খোলা হয়। সকালের অনেক পাঁচালি মিটিয়ে সময় সুবিধে মতো একবার কড়াং করে তালাটা খোলা হয়, ঘরের মেঝেয় ঝপাঝপ দু বার ঝাড়ুর ঝাড় পড়ে, তারপর পাড়া জানিয়ে ঘণ্টাটার বাদ্যি ওঠে ঢং ঢং। ··তারপর আর কী। পাথরের নুড়ির গায়ে দুখানা তুলসী ছুঁড়ে মেরে একখানা ময়লা পেতলের থালায় দুখানা বাতাসা সামনে ধরে দেখিয়েই বলা হয়, ব্যস। ঠাকুর হে এবার মুখ মুছে ঘুমিয়ে পড়ো। সেই কাল আবার এই সময় দেখা হবে। ·· আর আজ ? ওঃ। কী ভক্তির ঘটা। নুড়ি পাথররা অট্টহাস্য করে উঠতে পারে না এই রক্ষে। কথা বলার সঙ্গে যেন হাসির জলতরঙ্গ বাজে।

সর্বোত্তমা বলে ওঠে, 'আপনি কে' জিজ্ঞাসা করতে তো বললেন, 'কেউ না'। কিন্তু নামটা তো জানতে পারি ?

এই সেরেছে। কেউ না'র আবার নাম কী ? ভূতের কী 'জন্মদিন' হয় ?

পরিচয় দেবেন না ? অথচ আমাকে তো দিব্যি 'বৌদি' ডাকলেন।

সে তো ডাকবোই। পাড়ার মেয়ের পাড়ার যে কোনো বৌকেই 'বৌদি' বলে ডাকার আইনসঙ্গত অধিকার আছে।

সর্বোত্তমা হঠাৎ কী ভেবে বলে ওঠে, ওঃ। বুঝেছি।

কিন্তু ঠিক এই সময় রমার মা চা নিয়ে আসে! কোথা থেকে একখানা কোণ-বোঁচা, খ্যাদা খোঁদা ছোট কাঠের পিঁড়ি যোগাড় করে ফেলে সেটাকেই ট্রে বানিয়ে তার ওপর তিন পেয়ালা চা, আর একটা কাঁচের বাটি ভর্তি ডালমুট। যে বস্তুটি দেদার নিয়ে এসেছে সর্বোত্তমা। অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখে না রমার মা। চামচও এনেছে সঙ্গে। পিঁড়ি-সুদ্ধই নামিয়ে দেয় এদের সামনে। এবং হ্যারিকেনটাকে আর একবার গুছিয়ে বসায়।

'পাড়ার মেয়ে'টি হঠাৎ বলে ওঠে, বৌদি আমার গায়ে একটা চিমটি কাটুন তো!

মানে!

চমকে ওঠে পরমেশ্বর! কারণ এহেন বাক্যের রহস্য তার জানা নেই। তা হলে কী তখনকার সন্দেহটাই সত্যি? কিন্তু সর্বোত্তমা বাঙালি ঘরের মেয়ে, স্কুলে কলেজে আত্মীয় সমাজে ঢের মেয়েলী কথার চাষ দেখা আছে। তাই হেসে ফেলে বলে, কেন?

দেখবো বেঁচে আছি না স্বর্গারোহণ করেছি। এই মারকাটারি পরিস্থিতিতে মুহূর্তের মধ্যে সামনে গরম চা, সঙ্গে চানাচুর। এ তো রীতিমতো 'স্বর্গীয়' ব্যাপার। তাই ভাবছি—

সর্বোত্তমা হেসে ওঠে, সত্যি বলতে আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমাদের রমার মা অসাধ্যসাধন করতে পারে। এবং প্রায় বিনা হাতিয়ারেই। 'ট্রে' যোগাড় করেছে দেখুন। নিন ধরুন।

'পাড়ার মেয়েটি' এক কাপ চা হাতে নিয়ে হেসে বলে রেলগাড়ি ধায় হেরিলাম হায় নামিয়া বর্ধমানে, কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে'। ইনি বোধহয় 'পুরাতন ভৃত্যের' মহিলা সংস্করণ?

পুরাতন তো নিশ্চয়ই। তো কই 'পাড়ার মেয়ে' চানাচুর দেখে মোহিত হলেন, নিচ্ছেন কই?

এই তো নিচ্ছি!

এতক্ষণে পরমেশ্বর একটা কথা বলে ফেলে। এবং সেটি রীতিমতো বোকার মতোই, নিন না বেশি করে। অনেক আনা হয়েছে।

বোকার মতোই কথা। অন্তত এমন একখানা ছুরির ধার মেয়ের সামনে। মেয়েটা হাসতে গিয়ে বিষম খায়। তারপর বলে ওঠে, অনেক

থাকলেই পেটের মধ্যে অনেকটা চালান করে ফেলার ক্ষমতা কী সকলের থাকে? তবে থাকা হয়তো উচিত ছিল, 'হেরিডিটি'র নিয়ম অনুসারে।

কিন্তু সর্বোত্তমা হঠাৎ বলে ওঠে, ইস্। আপনার পরিচয়টি আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম, কিন্তু ঘোষণা করায় বাদ সাধলেন।

আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন?

সম্ভবতঃ।

তা বাদটা সাধা হলো কিসে?

এখন বলবো না। আপাতত রহস্যময়ীই থাকুন।

অথবা পেত্নী কিংবা শাঁকচুন্নী। হি হি হি। আপনার কর্তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সেই সন্দেহটাই জোরালো। যা হতভম্বভাবে বসে আছেন।

কথাটা হয়তো সত্যি।

পরমেশবর এই একখানা পরিচয়-না-জানা বেপরোয়া মেয়েকে দেখতে দেখতে যেন আচ্ছন্ন মতো হয়ে গেছে। শহর বাজারের কথা আলাদা। কিন্তু এই অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে অতি তুচ্ছ সাজসজ্জার খোলসে আবৃতা এমন একখানা অগ্নিশিখার মতো মেয়ে! ভাবা যায় না। কথার ধরন ধারালো, গলার স্বর, চাঁছাছোলা হয়েও যেন সুরেলা। আরো দেখে অবাক হচ্ছে, মেয়েটার মোমে ফর্সা ধবধবে দুখানা হাত একদম খালি। গ্রামে-ঘরে এতবড়ো মেয়েকে এমন 'ন্যাড়া হাতে' ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় কী? অথচ বিধবা নয়, নিশ্চয়ই। পরনের শাড়িখানা সস্তা হলেও বৈধব্যের বাহন নয়। অন্ততঃ যারা হাত ন্যাড়া করাটা মানে, তাদের কাছে।

আশ্চর্য। সর্বোত্তমা বেশ স্বচ্ছন্দে কথা বলছে। বেশ জমিয়েই নিয়েছে দেখা যাচ্ছে। ওকে বললো, 'পরিচয়টা আবিষ্কার করে ফেলেছে।' মানে বোঝা গেল না।

মেয়েটা এবার উঠে পড়ে বলে যাক খাওয়াদাওয়া তো হলো, এবার কাটছি। বৃষ্টি কমে গেছে।

সে কী! এখনো তো খুব বৃষ্টি হচ্ছে।

সর্বোত্তমা বলে, আর একটু বসে যান! ভীষণ ভিজে যাবেন!

ও কিচ্ছু না! অভ্যাস আছে।

বলে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, সিন্দুকটা খুলতে পারেননি তো?

সিন্দুকটা !

পরমেশ্বর আবার ভীত হয়। আপনি সিন্দুকের কথা জানেন !

আমি ? হি হি ! এই নবীনগঞ্জের মাছিটা পর্যন্তও জানে এবাড়িতে একটা তালাবন্ধ সিন্দুক আছে, যার চাবি হারিয়ে গেছে. ওটি এখানের কিংবদন্তী বিশেষ। বৌদিকে দেখে মনে হলো, এবার হয়তো বন্ধ সিন্দুক খুলতেও পারে।

সর্বোত্তমা বলে ওঠে, বুঝতে পেরেছেন ? সত্যি বলতে ওই চাবিবন্ধ সিন্দুকটার রহস্য ভেদ করবার ইচ্ছেতেই আমার আসা ! কিন্তু চোর ডাকাতে সে কাজটা এখনো না করে রেখে দিয়েছে কেন বলুন তো।

সেই তো রহস্য। না হলে আর মহাত্মা মোহন ভটচায্যির হাত এড়িয়ে এখনো—বলেই হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলে, আচ্ছা আপনাদের সঙ্গে বিছানাপত্র দেখছি না তো ? লাগবে না ?

সর্বোত্তমা বলে, সে ম্যানেজ করা যাবে। হাওয়া বালিশ, হাওয়া তোষক এখন চুপচাপ ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে আছে। সময়ে ফুলে উঠবে।

ও ! বুঝেছি। হাওয়া বালিশ তো থাকে দেখেছি। হাওয়া তোষকও আছে বুঝি ? গাঁইয়া ভূতেরা আর কীই বা জানে ? আচ্ছা চলি

বলেই চট্ করে দাওয়ায় বেরিয়ে ঝুপঝুপ বৃষ্টির মধ্যেই অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। খালি পা, খালি মাথা।

ও চলে যাওয়া মাত্রই পরমেশ্বর বলে ওঠে, এরকম জায়গায় এরকম একটা মেয়ে ! খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না।

সর্বোত্তমা বললো জায়গাটার আর তুমি কতটুকু দেখেছ ?

তবু—আন্দাজ তো থাকেই একটা। ওই তো টিউবওয়েলের ধারে, রাস্তায় এখানে সেখানে দেখলাম তো অনেককেই। ঠিক এরকমটি—

সর্বোত্তমা একবার স্থির চোখে তাকিয়ে বলে, রূপের কথা বলছো ?

সেটা তো আছেই। তাছাড়াও যেন অন্য আরো কিছু আছে।

সর্বোত্তমা মুচকি হেসে বলে, দেখো, যেন আবার প্রেমে পড়ে বসে আমায় ভাসিয়ে দিও না !

নেহাৎই ঠাট্টার কথা। তবু কেন কে জানে পরমেশ্বর হঠাৎ ভীষণ রেগে উঠে বলে, তুমি আমায় কী ভাবো বল তো ? মেয়েরা এই রকম সন্দেহপ্রবণই হয় বটে !

তাই না কী ? এত মেয়ে দেখলে কবে ?

থামো। ফট করে যা তা ভাবনা, ভাবতে আসেওবা।

সর্বোত্তমা এখন বেশ শান্ত গলায় বলে, ভাবনাটা অবশ্য তখন আসেনি। এখন মনে হচ্ছে আসতেও পারে।

সবসময় হেঁয়ালি করে কথা বলে যে কী সুখ পাও।

বলে পরমেশ্বর সেই পাতা শতরঞ্জটার ওপর শুয়ে পড়ে।

সর্বোত্তমা একটা হাওয়া বালিশকে ফুলিয়ে এনে ওর ঘাড়ের নিচে ঠেলে দিয়ে বলে এটা নাও। শুধু শুলে ঘাড়ে ব্যথা হবে।

দরকার নেই। ঠিক আছে!

সর্বোত্তমা একটু হেসে বলে, জানো তো পরিহাস পরিপাক করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে ধরে নিতে হবে পাকস্থলীর অবস্থা খারাপ! চিকিৎসার দরকার। তবে চিকিৎসার অতীত হয়ে পড়লে?

দ্যাখো তুমি আমায় কিন্তু ভীষণ রাগিয়ে দিচ্ছো! একে তো শখ করে শুধু শুধু এই দুর্ভোগ পোহাতে আসা আবার—

শুধু শুধু কীগো? তবে যে শুনে এলাম পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি চাটি করে বেচে দিয়ে কিছু অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আসা!

অঃ। তুমিও বুঝি সেই উদ্দেশ্যের অংশীদার?

আমার কথা বাদ দাও। মুফতে দুদিন বেড়িয়ে নেওয়া। তো আমার ললাটলিপিতে যদি তার মধ্যেই কালবৈশেখীর ঝড় ওঠে, বাঁশবনের অন্ধকার থেকে সুন্দরী রূপ ধরে পেত্নী এসে দেখা দেয়, নাচার।

পরমেশ্বর ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলে, ঠাট্টা করছো? আমার কিন্তু তখন সত্যিই ভয় ভয় করেছিল।

কখন?

যখন হঠাৎ তোমার হাত চেপে ধরে অন্যদিকে নিয়ে যেতে গেল!

এখন আর ভয় করছে না তো?

যখন দেখলাম অন্যদিকে হলেও, ভুল দিকে নয়! তখন—

ভাগ্যিস!

সর্বোত্তমাও হঠাৎ খিল খিল করে হেসে বলে, ভাগ্যিস! পথ দেখাবার ছুতোয় আমার হাতটা না ধরে যদি তোমার হাতটা ধরে বসতো! নির্ঘাৎ —ভুল দিকে টেনে নিয়ে যেতো।

পরমেশ্বর আবার শুয়ে পড়ে হতাশভাবে বলে, এক একসময় তোমার মাথায় যে কী চাপে। কই আগে তো এরকম দেখিনি।

আগে ? আগে মানে ?

মানে বিয়ের আগে। কমদিন তো দেখিনি তখন।

সর্বোত্তমা ঈষৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, সেই দেখা আর এখনকার 'দেখা' এক ? ...খোলা আকাশের নিচে দেখা এক, আর চার দেওয়ালের মধ্যে দেখা এক ? · বন্ধনহীন গ্রন্থির মুক্ত হাওয়ায় দেখা 'এক' আর 'গাঁটছড়া' বাঁধার সাত-গেরোর মধ্যে দেখা আর ...আশমান জমিন ফারাক ! বুঝলে হে !

হুঁ ! বুঝলাম। পরমেশ্বর ভারীমুখে বলে. তবে এটা ঠিক বুঝলাম না, হঠাৎ ওই মেয়েটাকে বলে বসলে কেন তার পরিচয় আবিষ্কার করে ফেলেছ।

করে ফেলেছিলাম বলেই বললাম।

করে ফেলেছ !

হুঁ। কেন তোমার মাথায় আসেনি ?

আমার মাথায় !

তা বটে তোমাদের মাথাটাথা যে সলিড ধাতু দিয়ে তৈরি।....আমি ধরে ফেলেছি - ভটচাযিা মশাইয়ের বড়মেয়ে।

তার মানে ? ইয়ার্কি না কী ? ওই পোড়াকাট বুড়োর ওই মেয়ে ?

তাতে কী ? এমন হয় না ? ইতিমধ্যেই শুনে নিয়েছি ভটচায্যি মশায়ের মা নাকি ছিলেন পরমাসুন্দরী। অগ্রদ্বীপের না কোথাকার গোঁসাইবাড়ির মেয়ে। ঠাকুমা-পিসিমার মতোও দেখতে হয় অনেকে !

শুধুই তো চেহারা নয়, কথাবার্তা ? ওই বাড়িতে ওই মেয়ে ?

সে নমুনা তো তোমার বাবা-কাকা আগেই দেখে গেছেন। গল্প শোনোনি !

আশ্চর্য !

সর্বোত্তমা হঠাৎ বলে ওঠে, আরো আশ্চর্য, যে আমরা দুজনে এখন নিশ্চিন্ত হয়ে পাড়ার মেয়ের রূপচর্চা করছি। বাবা এখনো ফিরলেন না, সে খেয়াল করছি না।

পরমেশ্বর বলে, বাঃ। বৃষ্টি না থামলে আসবেন কী করে ?

থেমে গেছে।

না না। পরমেশ্বর উঠে দরজা খুলে শূন্যে হাত বাড়ায় ! এখনো ঝিরঝির করে পড়ছে।

ওতে চলে আসা যায়।

দরকার বুঝছেন না হয়তো। ঠাকুরের ঘরের মধ্যেই তো আটকে রয়েছেন। ওটা তো বেশ মজবুত বলেই মনে হলো। তাছাড়া—একতলা বাড়ি চট করে পড়ে যায় না। এইবার এসে যাবেন।

কথাবার্তা স্বাভাবিক তালে এসে যাওয়ায় আপাত শান্তি। তবু পরমেশ্বরের মনের মধ্যে প্রশ্নটা পাক খেয়ে চলেছে—সর্বোত্তমার অনুমানটা কী সত্যিই ঠিক? ওই হতভাগা মোহন ভটচায্যির ওই বিদ্যুৎ-শিখার মতো মেয়ে!

....

লালকমল অর্থাৎ লালু উচ্ছ্বসিত গলায় বলেন, ওঃ। খুব একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো তোমার বটে। কী বল বৌমা?

দারুণ বাবা!

তোমরা বেরিয়ে পড়ার পরই তো ঝড়টা চেপে এলো। বৃষ্টির আগে ছুটে চলে আসতে পেরেছিলে তো?

হুঁ—উ!

ভটচাযও তাই বললো, ভাবনা করছেন কেন দাদা? এক ঢিলের তো রাস্তা। ওই রান্নাবাড়িটা পড়ে গিয়ে স্তূপ হয়ে আছে বলেই পুকুর-পাড় দিয়ে ঘুরে যাওয়া। নইলে তো এক চত্বরের মধ্যেই।

আপনি এতক্ষণ কী করলেন?

আর বলো না মা। ভটচায্যির যতো দুঃখের গাথা শুনতে হলো বসে বসে! পাড়ার লোক ওর প্রতি কী রকম বিরূপ, ওর নামে কত মিথ্যে বদনাম দেয়। অথচ ও বেচারী ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। হা হা হা। চলে আসার উপায় নেই। ঝড়টা কব্জা করে রেখেছে।

সিন্দুকের চাবি খুঁজে বার করার কথা কিছু হলো না?

লালু মাথা নাড়েন। বলেন নতুন কিছু বললো না। বললো, চির-কালই দেখছে চাবি হারানো সিন্দুক।

আচ্ছা বাবা চোরটোরেরা কেন রেখেছে বলুন তো। স্রেফ তো বেওয়ারিশ মাল হয়েই পড়ে আছে, ভাঙতে তো পারতো?

সেইটাই এক রহস্য!

লালু বলেন, ভটচায্যি হঠাৎ মুখফস্কে বলে ফেলেছিল, ওর আসল

ইতিহাস না কী পাড়ার 'ভূষণ্ডিবুড়ি' জানে। তো—

কি বুড়ি?

বললো তো 'ভূষণ্ডিবুড়ি'! পাড়াসুদ্ধ, লোকে না কি ওই নামেই ডাকে। বয়সের নাকি গাছ-পাথর নেই বুড়ির, আর বললো কী, আমাদেরই নাকি নিকট জ্ঞাতি। এ বংশের সব হিস্ট্রী জানে।

অ্যা? সত্যি?

তাইতো বললো। তারপরই বোধহয় বলে ফেলাটা ভুল হয়েছে ভেবে তাড়াতাড়ি বললো, ভীমরতি ধরা বুড়ি। কী বলে আর কী না-বলে। কেউ ওর কথা ধর্তব্য করে না। তবে হ্যাঁ জ্ঞাতি বটে।

উহুঃ। তা বললে চলবে না। আমাদের তো তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে বাবা! কী জানি উনিই চাবির খবর রাখেন কিনা। তাছাড়া —যখন বলেছেন জ্ঞাতি।

ছাত ফুঁড়ে জল পড়েনি, তবে জানলা দরজার তলা দিয়ে জলস্রোত এসে ঘরের দেয়ালধারগুলো থৈ থৈ করছিল। রমার মা ঝাঁটা ন্যাতার সাহায্যে ঘরকে শোবার যোগ্য করে বলে ওঠে, কাল তো গরম গেছে খাট চৌকি না হলেও চলেছে। আজ তো দিব্যি ঠাণ্ডা বাতাস। শোবে কেমন করে? কে কোথায় শোবে।

সর্বোত্তমা বলে ওঠে, সিন্দুকের ঘরটায় আমি শোবো!

লালু একটু সমঝে বলেন, না বৌমা। সেটা বোধহয় পরম পছন্দ করবে না। ঘরটায় ওর কেমন ভয় ভয় আছে।

ও পছন্দ না করলো তো কী হলো? আমি শোবো বলেছি। আমার ভীষণ আকর্ষণ ওই ঘরটায়। ওই যে জানলা খুললেই একটা মন্দিরের চূড়ো দেখা যায়। চুড়োর মাথায় ঝকঝকে ত্রিশূল। কীরকম একটা গা-ছমছমে ভালো লাগা ভাব আসে।

এই সময় রমার মা হাঁক পাড়লো, এবার খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লি হতো।

খেয়ে নিয়ে। খাবার যুগ্যি এবেলা আবার কী করেছ গো? আমি তো ভাবছিলাম ওই প্রসাদের মিষ্টি টিষ্টি খেয়েই রাতটা—লালু বলেন।

রমার মা সতেজে বলে, সে আপনার চলতে পারে। দুটো জোয়ান ছেলেমানুষের তাই ব্যবস্থা হবে? ওই জনতা এস্টোভেই দুখানা নুচি

আর আলু চচ্চড়ি করে রেখেছি।

সর্বোত্তমা হঠাৎ রমার মার দুই কাঁধে হাত রেখে বলে ওঠে, সত্যি রমার মা, তোমার জবাব নেই। এবার থেকে তোমায় রমার মা না বলে 'আমার মাসি' বলবো।

স্নেহ জিনিসটা কী সুন্দর!

রমার মার মধ্যে সেই জিনিসটির ফলাও চাষ। তাই এত অসুবিধের মধ্যেও ও—

সর্বোত্তমা ভাবলো অন্য যে কোনো একটা কাজের লোককে নিয়ে এলে সে নির্ঘাৎ সারাক্ষণ অসন্তোষ প্রকাশ করতো আর সব কিছুতেই সর্বোত্তমাকেই দায়িত্ব নিইয়ে ছাড়তো।

হঠাৎ লালু জনান্তিকে বলে বসেন দেখো বৌমা, সব মানুষকে সব পরিবেশে ঠিক 'এস্টিমেট' করা যায় না। ওই তোমার রমার মা? তোমার শাশুড়ীর দাপটের তলায় সবসময় যেন জবুথবু। আর তেনার মুখে রাতদিন শুনতে হয় রমার মা কত অকর্মা। কত কুঁড়ে, কত নির্বোধ—অথচ এখানে দেখো?

সর্বোত্তমা হেসে ফেলে গলার স্বর নামিয়ে বলে, বাবা মনে রাখবেন দেওয়ালেরও কান থাকে। আর এখানে আমার শাশুড়ীর পুত্তুরটিও উপস্থিত আছেন।

লালুও হেসে ফেলেন।

রমার মা তার স্টক থেকে কলাপাতা বার করে খাবার সাজিয়ে দিয়ে বলে, শুদু নুচি আর আলু হেঁচকি। আমার কপাল। সন্ধ্যে থেকে কী দুয্যোগ! কী দুয্যোগ! দুকুরবেলা দেকে এয়েছিলুম জঙ্গুলে বাগানের মদ্যে, কুমড়ো শাকের ঝাড়ের ভেতর জালি জালি কুমড়ো, পাঁচিলধারের কাঁটাল গাছে হাতের মাতায় ছোট ছোট এঁচোড়। দেকেরেকে ভেবেছিলুম আপনাদের অসাক্ষেতে তুলে নিয়ে এসে তরকারি বানাবো। তো মুকপোড়া আকাশ যা শত্তুরতা করলো।

লালু হেসে বলেন, এর মধ্যেই তুমি যা বানিয়েছো রমার মা, কেউ পারে না। ওই দুর্যোগের সময় একা এই বাড়িতে যে ভয় পেয়ে অজ্ঞানটজ্ঞান হয়ে পড়োনি এই ঢের।

রমার মার মুখটা হঠাৎ একটু বদলে যায়। বলে, ভয় যে একেবারে

পাই নাই বাবু, তা বলব না। গাছপালারই মাতনের শব্দ, আমরা গাঁ ঘরের মেয়ে জানি সব, তবু মনে হচ্ছিলো, কোতায় যেন মেয়েমানুষের গলায় কে হু হু করে কাঁদচে। বলচে 'না না না'। তো পরে ভ্রম বুজলুম। অমন হয়। দুর্যোগের সময় গাছপালারাই যেন কতা কয়। কত ডাক ছেড়ে কাঁদে। যাক ওসব কতা। তবে আজ বাতাসটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পৃথিবী তেষ্টার জল খেয়ে বেঁচেচে। আজ কারো ঘুমের বিঘ্ন হবে না।

পরমেশ্বর বলে ওঠে, তোমার বৌদি তো বলছে—একা ওই সিন্দুকের ঘরে শোবে।

রমার মা সতেজে বলে, বললেই তো হলো না। অবোধ শিশু 'আগুনে' হাত দিতে চায়, চাইলেই ছেড়ে দিতে হবে? গার্জেনে তার হাত টেনে নেয় না?

ও ঘরে কী আগুনের ভয় আছে?

রমার মা গলা নামিয়ে বলে, একটা 'কিছু' যেন আছে বাপু! ঘরখানায় ঢুকলেই গাটা যেন ডোল হয়ে ওঠে।

তবে আর কী করা।

হাওয়া বিছানা ফুলিয়ে মাঝখানের ঘরে লালু। এপাশের ঘরে তস্য পুত্র পুত্রবধূ। ভিতরদালানে রমার মা।

পরমেশ্বর ঘোষণা করে বলে, বাবা। আমি কিন্তু কাল চলে যাচ্ছি।

কেন? বৌমা যে বললো, তোর কিছু ছুটি পাওনা আছে।

থাকলেই যে নিতে হবে তার মানে নেই। কালই যাবো।

কী মুশকিল! কখন যাবি? কাল তো আবার ভটচাযের ওখানে—

রাখো বাবা তোমার ভটচাযের কথা। একেরনম্বরের ঘুঘু।

....

সকালবেলা ঝলমলে আকাশ। তার নিচে ঝড়াহত বৃক্ষলতাদের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকার দৃশ্যটি বড় করুণ এবং ভয়াবহও।

সক্কালবেলাই কে একজন শুনিয়ে গেছে অনেক গাছ পড়ে গেছে। অনেক চালাঘর উড়ে গেছে। তবু সকালবেলায় যথারীতি ময়রার দোকানে দোকানে উনুনে আঁচও পড়েছে, বাড়ি বাড়ি আহারচিন্তার কাড়ানাকাড়াও বেজে উঠেছে। গোয়ালারা গাই দুইবার উদ্দেশ্যও বেরিয়েছে। দেখা যাক, কার গোয়ালে কী ঘটেছে কাল।

তবে আজ ইস্কুল হবে না এটা নিশ্চিত। হলেও কেউ যাবে না।

সুযোগসন্ধানী ফালতু কুচোকাচার দল তাই দল বেঁধে এখানে ওখানে লিকলিকিয়ে বেড়াচ্ছে, ঝড়ে বিধ্বস্ত ভূমিসকলের মধ্যে থেকে লাভজনক কিছু সংগ্রহ করা যায় কিনা।

কী সে ? তা জানে না। ফল-পাকুড় নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই ওদের। কাঁচা খাবার মতো ফল আর এ সময় কী আছে ? কুমড়োটা পাকা পেঁপেটা ঝড়ে পড়ে যাওয়া কলাগাছের আধকাঁচা কাঁদিটা ওসব নেবার জন্যে পাড়ার বুড়িরাই ঘুরছে। এদের বাসনা 'অন্য কিছু'।

তবে ঝড়ের পরের আমবাগানের দৃশ্যটি বড় করুণ।

এ তো আর জ্যৈষ্ঠের ঝড় নয় যার জন্যে ছেলেপুলের 'অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি জুটি আম কুড়াবার ধুম' পড়ে যাবে। এ হলো চৈত্রের ঝড়। তাই আমগাছতলায় অজস্র ঝরাপাতা আর ভাঙাডালের খাঁজে খাঁজে মাতৃঅংকচ্যুত নিতান্ত শিশু আমগুলি দেখে দুঃখই জাগছে। সংগ্রহের স্পৃহা আসছে না। তবু বুড়িরা কুড়োবে আমচুর বানাতে। তবে— আমবাগান আর তেমন আছে কই !

বৃহৎ বৃহৎ বাগান এখন দু'চারটি গাছের মূর্তি নিয়ে পড়ে আছে ! আমবাগানের মালিকরা যেদিন থেকে হঠাৎ টের পেয়ে গেছে বছরে বছরে গাছের ফল বেচার চেয়ে অনেক বেশি লাভজনক একেবারে গাছটাকেই কাঠের দরে বেচে দেওয়া সেদিন থেকেই দীর্ঘ-আয়ুবাহী বিশাল বিশাল বৃদ্ধ বৃক্ষদের কোমরে কুড়ুলের ঘা পড়তে শুরু করেছে। কুড়ুলই বা কেন ? এখন তো কলের করাত !

একবেলার মধ্যে একশো বছরের ইতিহাস সাফ। কাঠ এখন 'সোনা'র তুল্য !

যেমন সোনার তুল্য হয়ে উঠেছে মাটি। সারাবছর খেটে পিটে 'খাদ্য ফসল' তোলার থেকে অনেক লাভ হলো জমিটা 'বেওয়াসী'দের হাতে তুলে দেওয়া ! তার সঙ্গে ভিটেমাটিও !

অতঃপর ?

বৌ-ছেলের হাত ধরে জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় শহরের রঙিন আলোর হাতছানিমুখো হওয়া। তারপর ? কে জানে কার ভাগ্যে কী ? বস্তিতে বাস ? তেমন কপাল করলেও তো ভালো। নচেৎ হাওড়া শেয়ালদা ইস্টিশান আছে ! সেখানে মাথার ওপর ছাউনি জোটে। তাও

না জুটলে ফুটপাথ আছে।

ছেলেপুলেগুলো ? কয়লার ঘেঁষ কুড়োতে ওস্তাদ হয়ে উঠবে। ছিঁচকে চুরিতে ওস্তাদ হয়ে উঠবে। দু একটা হয়তো ছিটকে হারিয়েই যাবে।

এই পৃথিবীতে মানুষ নামক জাতটার জীবনধারা তো বয়ে চলে এসেছে -ধনী মহাজন মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তদের অবলম্বন করে নয়, এই এদের অবলম্বন করেই।

তো সেকথা যাক। কথা হচ্ছে, ঝড়ের পরের সকালের সর্বোত্তমাকে নিয়ে। সর্বোত্তমা আজ চা-টা খেয়ে নিয়ে দারুণ সেজেছে! না জরি জড়োয়া দিয়ে নয়, সৌন্দর্যবোধের মধ্য দিয়ে। সর্বোত্তমার এখন পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালেতে টিপ। লাল ডিজাইন শাড়ি, লাল টিপ! হাতে শুধু একগাছা পলার বালা। গলাতেও অতি চমৎকার একগাছা পলার মালা! ব্লাউসটা টুকটুকে লাল সিল্কের।

সবটা মিলিয়ে যেন একটা আলো ঝলসানো আভা।

বলে উঠলো, মাসি, তুমিও একটা ফর্সা কাপড়-জামা পরে নাও। চলো, পাড়া বেড়িয়ে আসি।

রমার মা গালে হাত দিয়ে বলে, ওমা আমি তোমার সঙ্গে পাড়া-বেড়াতে যাবো কী গো ? রান্নাবান্নার ব্যবস্থা নেই ?

মাই গড্। রান্না কী গো ? আজ আমাদের সকলের ঠাকুরমশাইয়ের বাড়িতে দুপুরে নেমন্তন্ন আছে জানো না ?

না, কেউ তো বলে নাই।

বাবা বোধহয় ভেবেছেন, শুধু আমায় বললেই হবে। যাক আজ তোমার ছুটি।

রমার মা গলা নামিয়ে বলে, বামুন পুরুত মানুষ, পেন্নাম ঠুকেই বলছি, কঞ্জুষ বুড়োর যে হঠাৎ এত শখ ?

আহা না না! উনি তো আমাদের ওর ওখানেই খেতে থাকতে বলছিলেন। তো আমাদেরই ইচ্ছে হয়নি! বাবা কাল 'নারায়ণের পায়েস ভোগ' হবার জন্যে কী সব দিয়ে এসেছেন, তাই ধরাধরি। শুধু পায়েস প্রসাদ কেন, সবই খেতে হবে।

রমার মা মুচকে হেসে বলে, তাই বলো। মাছের তেলে মাছ ভাজা। তা চলো তা'লে কোথায় যাবে ? চেনো কাউকে ?

আরে বাবা চিনে নিতে কতক্ষণ? বাবাকে বলেছি।

তো দাদাবাবুকে সঙ্গে না নিয়ে আমারে?

আরে রাখো তো তোমার দাদাবাবু! তিনি এখনো পড়ে ঘুমোচ্ছেন।

বেরিয়ে পড়ে দুজনে।

লালু চারিদিকের বিধ্বস্ত পরিবেশের মধ্যে অন্যমনস্কভাবে ঘুরছিলেন। সর্বোত্তমা কাছে এসে বলে বাবা! বেরোচ্ছি।

লালু বলে ওঠেন, বাঃ। এ যে লক্ষ্মী প্রতিমা! তো কোথায় কোন দিকে যাবে?

আগে তো আপনাদের সেই ভূষণ্ডিবুড়ির বাড়িতে যাই। আর কে কে আছে যেন বাড়িতে?

আছে। নড়ে ভোলা নাতিপুতি আর তাদের বৌ ছেলে আছে কিছু কিছু! বাড়িখানা বৃহৎ। প্রাসাদতুল্য বললেই হয়। তবে—যা হয়—ঠিকমতো মেইনটেনেনসের অভাবে জীর্ণ।

আচ্ছা বাবা, গ্রামে এক একটা সমৃদ্ধ পরিবার ক্রমশই দৈন্যদশাগ্রস্ত হয়ে যায় কেন বলুন তো? কেউ উন্নতির দিকে যায় না।

কেন আর? অলসতা। কোনমতে যদি দিন চলে যায়, কে আবার খাটতে যাবে? এই আমাদের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতা। ক্রমশ যদি অবস্থা দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যেতে থাকে 'ভাগ্য'কে দায়ী করবো, সরকারকে দোষারোপ করবো। ব্যাস।

সর্বোত্তমা তার শ্বশুরকে এ ধরনের ভাব-ভাবনা করতে বিশেষ দেখেনি। একটু আশ্চর্যই হলো। আর ওই ওনার বলা কথাটাই মনে পড়লো 'সবাইকে সব পরিবেশের মধ্যে এডজাস্টমেন্ট করা যায় না'।

কে বলতে পারে অতিরিক্ত দাপুটে গৃহিণীর কব্জায় পড়ে থেকে ওর ভাবনার ঘরটার দরজা বন্ধ করে রাখেন কিনা? একটা মানুষ কেন অন্যজনের ষোলো আনার নিয়ন্ত্রক হবে? কেন, দাম্পত্য সম্পর্কটি এতই অমোঘ হবে যে, একজন অপর জনকে সম্পূর্ণ নিজের অধিকারভুক্ত বলে মনে করবে?

রমার মা পথ চলতে চলতে গত সন্ধ্যার 'ঝড়ে'র প্রতিক্রিয়ার কথাই বলে চলেছে। তার বৌদিদি চুপচাপ।

পাড়ার পথচলতি লোক সর্বোত্তমাকে সেই ভুষণ্ডিবুড়ির বাড়ির

হদিস দিয়ে দিল! নবাগতা সর্বোত্তমাকে দেখে কেউ কেউ ঈষৎ কৌতূহলী হলেও সেটা প্রকাশ করল না। এ বিষয়ে এ যুগ বেশ সভ্য হয়ে উঠেছে। নবীনগঞ্জের লোকেরাও। তাছাড়া আজকাল কত লোক কত ধান্দায় আসে। ছবির লোকেশান ঠিক করতেও কত সময় চিত্র পরিচালকরা পুরনো কালের ভাঙা অট্টালিকার খোঁজ করে বেড়ান।

তা লালু ভুল বলেননি। প্রাসাদতুল্যই বলা যায়। তবে বয়সের ভারে জীর্ণ বিবর্ণ! ছাদের কার্নিশের খাঁজে খাঁজে গাছ গজিয়ে গেলেও এখনো কোথাও কোথাও কার্নিশের গায়ে শিল্পকলার চিহ্ন বিদ্যমান।

খবর পেয়ে খালি গা লুঙ্গি পরা আধবুড়ো লোকটা তাড়াতাড়ি গায়ে একটা আধময়লা মোচড়ানো কোঁচকানো পাঞ্জাবি চাপাতে চাপাতে এসে বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়। নিশ্চয়। দেখা হবে না কেন? আপনারা এসেছেন শুনেছি। আপনারা তো আমাদের আপনজন। ঘোষাল বাড়ির নিকট জ্ঞাতি বলতে তো আমরাই। অবিশ্যি পৈঁঠে নামতে নামতে এই আপনাদের সঙ্গে ধরুন গিয়ে আমার নাতির বোধহয় পাঁচ জেনারেশন হয়ে গেল। দেশে ঘরে থাকলে এখনো মরলে—অশৌচ লাগতো। তা এখন আর কে কার কড়ি ধারে? এখন আপন জ্যাঠা কাকা মরলেই অশৌচ নিচ্ছে না। মসমসিয়ে জুতো পায়ে বেড়াচ্ছে, মাছ মাংস খাচ্ছে।

বুড়ো ভদ্রলোকের কথাগুলি রমার মার যেন বেশ পছন্দই লাগে। কিন্তু সর্বোত্তমার ভিতর থেকে হাসি উথলে উঠতে থাকে। কষ্টে সামলে নিয়ে বলে, তো এসময় এসে বোধহয়—একটু অসুবিধে করলাম?

না না। সে কী? ঘরের বৌ। এই নবীনগঞ্জে এ তল্লাটে এই 'ঘোষাল বাড়ি বলতে ছিল একটাই। কালক্রমে যা হয়। বাড়ি অবশ্য দুটোই, কারণ আমার ঠাকুর্দার বাবা কোলিয়ারিতে কাজ করে, প্রচুর টাকা কামিয়ে এসে এই বাড়ি বানিয়েছিলেন। আর ওই ত্রিভুবনেশ্বর ঘোষালের বাবা—

একটা ফ্রকপরা মেয়ে 'দাদু বলে ডেকে ঢুকে এসে দাদুর গা ঘেঁষে খুব মৃদুস্বরে কী বললো। এবং তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, ইস্! তাইতো! তাইতো, মা লক্ষ্মীকে বারদালানে দাঁড় করিয়ে কথা বলছি! ছি ছি! বুড়ো হলে যা হয়। যা নিয়ে যা ভেতরে তোর দিদার কাছে। …তোমার শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হয়েছে কাল রাস্তায়, সম্পর্কটা 'খুড়ো' না 'দাদা সেটা এখনো ঠিক না হওয়ায়—তেমন জমেনি। ত্রিলোকেশ্বর

ঘোষালের সঙ্গে আমাদের—

দাদু !

হ্যাঁরে বাবা হ্যাঁ। যা! তো ওই মোহন ভটচায্যিটা তো বৌমা, তলে তলে তোমাদের সব্বস্ব গ্রাস করে চলেছে। দেবতার ছেলে দানব। বাবা সাধন ভটচায্ কী ছিলেন, আর এই এক কুলাঙ্গার —

চলুন আপনি—

বলে সেই ফ্রক পরা মেয়েটা সর্বোত্তমাকে প্রায় সবেগে আকর্ষণ করে ভিতরে নিয়ে যায়। এবং অতি ভদ্রভাবে রমার মার দিকে তাকিয়ে বলে —আপনিও আসুন।

তারপর একটু যেতে যেতে একটু হেসে ফেলে বলে, দাদু একটা নতুন মানুষ পেলে একদম কাঁকড়ার মতন কামড়ে ধরে। এখানে তো সবাই চেনা, কেউ ওর কথায় কান দেয় না। কেন দেবে? এককথা একশোবার শোনবার কার দায়?…ওই নিয়ে রাতদিন দিদার সঙ্গে ধুন্ধুমার ঝগড়া।

সর্বোত্তমা মনে মনে হাসে, কথার চাষটি বোধহয় বাড়িতে ভালোই। কতইবা বয়েস হবে মেয়েটার। বড়জোর বছর দশ।

এই যে দিদা।

বলে মেয়েটা যেন বেশ বিজয় গৌরবের ভঙ্গীতে বলে. দাদুর হাত থেকে ছাড়ান করিয়ে নিয়ে এলাম।

আঃ। থাম তো তুই।… এসো মা বসো।

বলে যে ভদ্রমহিলা সর্বোত্তমাকে আপ্যায়ন করেন, তাঁকে বেশ আত্মস্থ বলেই মনে হয়। ভারী ভারী চেহারা, তামাটে হয়ে গেলেও বোঝা যায়, একদা বেশ ফর্সাই ছিলেন। চওড়াপাড় শাড়ি পরনে, চেহারায় সদ্যস্নানের স্নিগ্ধতা। ভিজে এলো চুল, কপালে সিঁদুরের টিপ।

বলেন, তোমরা আসার খবর পেয়ে কাল থেকেই ভাবছিলাম, একবার গিয়ে দেখা করে আসি, একটু হাসলেন, তো সাহস হচ্ছিল না।

সাহস হচ্ছিল না।

তা বাপু সত্যিই, কখনো তো আসা-যাওয়া নেই, কী ধরনের লোক, যাওয়াটা পছন্দ করবে কিনা!

অদ্ভুত তো?

তা এই নবীনগঞ্জে অনেক 'অদ্ভুত' আছে। তাছাড়া ওই ছোটো

ভটচাযমশাই। উনি যে কার কাছে কার নামে কী বলে রাখেন! শাশুড়ী আসেননি?

সর্বোত্তমা একটু হাসে, না। উনি অসুবিধের মধ্যে একদম পারেন না। আমারও কী আসা হতো? নেহাৎ শ্বশুরমশায়ের কাছে ঝুলে পড়লাম তাই। উনি খুব ভালোবাসেন আমায়।

মহিলা একটু ক্ষুব্ধভাবে বলেন, শুনে বড় ভালো লাগলো মা। আমার তিন তিনটি ছেলে, বৌ, কেউই কাছে থাকে না। ছেলেদের দূরে দূরে কাজ। কালে কস্মিনে আসে। শ্বশুর বলে চেনেই না। যাকগে - নামটি কী মা তোমার?

সর্বোত্তমা হেসে ফেলে বলে, মা-বাবা এমন একখানি নাম দিয়ে রেখেছেন, লোকের কাছে বলতে হাসি পায়। নাম সর্বোত্তমা।

ও মা, এ তো খুব খাসা নাম।

অতঃপর টুকটাক প্রশ্ন করতে থাকেন, ক'দিন থাকা হবে? সত্যিই ভিটে বাড়িটা বেচে যাওয়া হবে কিনা! অবিশ্যি না বেচেই বা লাভ কী, যদি আসা-যাওয়া না হয়। এই যে—আমরা এই বৃহৎ পুরী আগলে পড়ে আছি, এরপর কী আর আমার ছেলেরা এ বাড়ি রাখবে?

বাড়িটা তো দেখছি খুব বড়, তিনতলা না?

সবটা তিনতলা নয়, খানিকটা অংশ। সেকালে এরকম রেওয়াজ ছিল। তোমাদের বাড়িটাতেও শুনেছি খানিকটা দোতলা ছিল। সে অংশটা পড়ে গেছে। তবু বড় ভটচাযমশাই খুব দেখাশুনো করতেন তাই—একতলাটা মজবুত আছে।

সর্বোত্তমা বৃথা সময় ক্ষেপ করতে চায় না, তাই আস্তে বলে, এ বাড়িতে একজন খুব বুড়ো ঠাকুমা আছেন না?

তা আছেন।

তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতাম।

হঠাৎ সেই মেয়ে বলে ওঠে, সেই 'ছেমো' বুড়ির সঙ্গে দেখা করবেন বলেই তো এসেছেন। তাই না? দাদু তো তাই বললো।

তুই কথা থামাবি?

মহিলা বলে ওঠেন, এই এক মেয়ে! কথার জাহাজ। মা-বাপ হারিয়ে আমাদের কাছেই মানুষ হচ্ছে। আমার বোনঝির মেয়ে। তো আছে তাই সংসারে টিকে থাকা। নিজের নাতি-নাতনীদের তো চোখেই

দেখি না। তা শোনো বাছা, একবার ওনার কাছে গিয়ে পড়লে তো আর সহজে ছাড়ান পাবে না আগে একটু চা খেয়ে নাও।

সর্বোত্তমা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না না, ওসব লাগবে না। এক্ষুণি চা খেয়েই বেরিয়েছি।

মহিলা একটু হাসেন, সে আর বলার কী আছে। সকালে চা না খেয়ে কী আর কেউ বাড়ি থেকে বেরোয়? তবু অন্য জায়গায় এলে আবারও খেতে হয়। এই প্রথম এলে, বংশের বৌ, একটু মিষ্টি মুখ তো অন্ততঃ করবেই?

মিষ্টিমুখ! ও বাবা! বরং ওই চা মুখই করান।

মিষ্টি ভালোবাসো না বুঝি? এখনকার মেয়ে-বৌরা সবাই দেখি তাই—

রমার মা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ইনি আবার মিষ্টি দেখলে আঁৎকায়।

মহিলা একটু হেসে এক নজরে তাকিয়ে বলেন, পিসশাশুড়ী বুঝি?

যদিও গলার স্বরে আর প্রশ্নের ভঙ্গীতে বোঝা যায় ওটা অনিশ্চয়তার সঙ্গে প্রশ্ন। কারণ ঠিক 'কাজের লোক'-এর মতো সাজ নয়। বুড়িবুড়িগুলোও তো আজকাল ছাপা শাড়ি পরে। হাতে পেতলের চুড়ি, কানে নকল সোনার টপ পরে কাজ করতে আসে। এ একেবারে ছিমছাম, রজতশুভ্র। তাই যা খটকা।

সর্বোত্তমা বলে, না, মানে, আমাদের মাসির মতো, সঙ্গে এসে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

মহিলা ঠিক বুঝে নেন এবং সর্বোত্তমাকে কাঁচের পেয়ালায় চা দিলেও রমার মাকে কাচের গ্লাসে দেন। এবং খাবারটি দেন সর্বোত্তমাকে ঝকঝকে কাঁসার রেকাবিতে এবং রমার মাকে পেতলের রেকাবিতে।.... তবে হ্যাঁ, দেখা গেল খাদ্যবস্তুর পরিমাণে সেই পার্থক্যের ত্রুটি পূরণ করেছেন। গোটা আষ্টেক মিষ্টি এবং তার সঙ্গে খান চারেক লুচি, পাশে বেগুন ভাজা। সর্বোত্তমাকে তার সিকি।

'এত কী খাওয়া যায়?' বলা সত্ত্বেও মহিলা ছাড়েন না।

সর্বোত্তমা সকৌতুকে বলে, আমরা তো হঠাৎ এসে পড়লাম, আপনিও ঘরের মধ্যে গেলেন আর এলেন, এত সব হলো কী করে? মন্ত্র পড়ে না কী?

মহিলা স্নিগ্ধ হাসি হাসেন। সকালে লুচির পাট এ বাড়িতে বাছা 'কমপালসরি'। এ নাকি ঘোষাল বাড়ির ঐতিহ্য। সকল সংসারে সকালে মুড়ি চিঁড়ে কিংবা এখন ঢুকেছে পাঁউরুটি, কিন্তু এ বাড়িতে—ওটি চাই। আমার বৌমারা এলে কথা শোনায়, ছেলেরা নাকি টোস্ট ডিম এইসব দেখলেই খুঁতখুঁত করে। তবে রবিবার চায়ের সঙ্গে লুচি আর ভাজা চাইই চাই। তার ওপর ঢালাও মিষ্টি।

সর্বোত্তমা হাসে, তাই বুঝি? তবে আমাদের বাড়িটাও তো 'ঘোষাল বাড়িই'। কিন্তু—

তোমার দিদিশাশুড়ী ছেলেদের নিয়ে ক'দিনই বা দেশে থাকতে পেয়েছেন? আগে আগে ঠানদির মুখে শুনেছি ওনার কথা। নাম ছিল নাকি স্বর্ণচাঁপা। ভারী ভালোমানুষ ছিলেন। দুর্বাসা শ্বশুরের ভয়ে সর্বদা কাঠ হয়ে থাকতেন। তা বেশিদিন ভুগতে হয়নি অবিশ্যি, স্বর্গে গিয়ে রেহাই দিয়েছেন। ছোট ছোট দুটো ছেলেকে নিয়ে সেই যে বাপের বাড়ি চলে গেলেন, আর কখনো ভিটেয় ফিরলেন না। দেখেছ নাকি দিদিশাশুড়ীকে? কতদিন বিয়ে হয়েছে?

নিজের জানা জগতের ইতিহাস সম্পূর্ণ অজানা একজনের কাছে শুনে সর্বোত্তমার মনের মধ্যে যেন একটা রোমাঞ্চ জাগে। আর বক্তাকে যেন 'আপন আপন' লাগে।

সর্বোত্তমার মহিলাকে বেশ ভালো লাগে। যদিও এঁর তিন ছেলে-বৌ, তবু বয়েসে হয়তো পরমেশ্বরের মার থেকে বিশেষ বড় নয়। লালু নীলু বিয়ে করেছিলেন একটু বেশি বয়েসেই।

উত্তরটা দেয়।

দেখেছে, এবং তাঁর কাছে এখানের কথাও শুনেছে কিছু কিছু, তাঁর 'স্মৃতির কোঠায়' তুলে রাখা সঞ্চয় থেকে!

বলে, বেশিদিন অবশ্য দেখিনি, বিয়ে হওয়ার কিছুদিন পরেই, তো কিন্তু 'সিন্দুকের' গল্প শুনিনি কোনোদিন।

সিন্দুক! সেই চাবিবন্ধ সিন্দুকের কথা বলছো? আছে সেটা এখনো? ছোট ভটচার্য্যির কবল থেকে রক্ষে পেয়ে রয়েছে এখনো? আমরা তো ধরেই নিয়েছি, তলে তলে ভেঙে-টেঙে সব শেষ করে বসে আছেন।

না মাসিমা—ঠিকই আছে।

ও মা! মাসিমা কীগো? আমি যে তোমার শ্বশুরবাড়ির লোক, খুড়শাশুড়ী জ্যাঠশাশুড়ী কিছু একটা হবো। হিসেব করে দেখতে হবে।

সর্বোত্তমা বলে, এসে তো দেখলাম বোধহয় জীবনেও হাত পড়েনি। এত ঝুল আর মাকড়সার জালে ঢাকা।

এবার তো শুনছি ভিটেবাড়ি বেচে দিতে আসা। তাহলে দেখালে গাঁথা সিন্দুককে ভেঙেই বার করতে হবে।

দেয়ালে গাঁথা!

ও মা! তা দেখোনি? খিলেনের মাঝের খাঁজে বসানো আছে দেখেছো তো? ওই পিঠের দিকটা দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা। তো দেয়ালই ভাঙো, আর সিন্দুকই ভাঙো।

আপনি সব দেখেছেন? গিয়েছেন ও বাড়িতে।

তা দু'চারবার গিয়েছি বৈকি। আগে আগে দিদিশাশুড়ীর যখন ক্ষমতা ছিল গেছি সঙ্গে। বড় ভটচায্‌মশাই খুব মান্য করতেন ওনাকে।

আচ্ছা ওর চাবির কথা কিছু জানেন?

চাবি পাওয়া যায় না তাই জানি। আর যা যা সব রটনা, তার সত্যি মিথ্যে জানিনে মা। এখন তো বুড়ির ভীমরতি অবস্থা। কী যে আবোলতাবোল বলেন. খেই ধরা শক্ত।··· তবে দেখা করতে এসেছো যাও একবার। ওরে শম্পা এনাকে তিন তলায় নিয়ে যা।

তিন তলায়। উনি তিন তলায় উঠতে পারেন।

উঠতে আবার পারার কী আছে? ···শম্পা হি হি করে হাসে, নীচে নামে না কী? ওই তিনতলাটার সবটা জুড়ে তো ওনার রাজ্য।····নাওয়া খাওয়া ঘুম সবের ব্যবস্থা। শুচিবাই বুড়ি সারাক্ষণ গামছা পরে থাকবে, কে ওনাকে লোক সমাজে রাখবে?

শম্পার দিদা আর একবার ধমকে ওঠেন, তোর কথার বাঁধুনি একটু কমাবি? সারাক্ষণ মেয়ের মুখে যেন খৈ ফুটছে। ওনার বয়েস হয়েছে—

সর্বোত্তমা বলে কত বয়েস হয়েছে?

সে বলা বড় শক্ত। এক এক সময় এক এক কথা বলেন। আমি তো বিয়ে হয়ে এসে পর্যন্ত শুনেছি, যম ওনাকে ভুলে বসে আছে। ওনার কালের সকলে 'যমের বাড়ি' গিয়ে হাজির হয়েছে। উনি পড়ে আছেন। এই শম্পা, বলে এসেছিস তো, একজন দেখা করতে যাচ্ছেন?

তা আবার বলবো না ? হি হি হি ‥একখানা ফর্সা কাপড় নিয়ে পরতে বলেছি বলে কী রাগ। বলে কী, কেন ? কোথাকার কোন রাজকন্যে আসছেন, তাই 'বারাণসী' শাড়ি পড়ে সেজে গুজে বসতে হবে ? হি হি একখানা থানকাপড়, তার নাম বেনারসী শাড়ি।

শম্পা। তোর হি হি থামা বলছি। ওখানে গিয়ে যেন ওরকম করিস না বাবা।

কী করবো দিদা ! ওনাকে দেখলেই যে আমার হাসি পায়। ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেই বলবে, এখানে আবার কী করতে এলি ? অ্যাঁ ? দেখছিস আমি একটু 'অভ্রমে' আছি। 'অভ্রম' মানে ওই গামছাপরা। ....হি হি হি। যতোক্ষণ রান্না করবে ততোক্ষণ—ওই গামছা।

রান্না ! নিজে রান্না করতে পারেন ?

না পারলে ?

শম্পা আবার খরখরিয়ে ওঠে, আর কারুর হাতে খাবে ? শুচিবাই যে। তো বামুনমাসি শুদ্ধু কাপড় পরে সব গুছিয়ে দেয়, উনি খুচখাচ খুন্তি নাড়েন।

সর্বোত্তমা অপ্রতিভভাবে বলে, ইস্। তাহলে তো এসময়ে আসা অন্যায় হয়েছে। এখন তো রান্নাটান্না....

এখন ?

মহিলা হাসেন, ওনার উনুনে আগুন পড়ে বেলা দুটোয়।

....

শম্পাকে হাসতে বারণ করাটা সমুদ্রে বালির বাঁধ।

সে প্রায় হেসে গড়াতে গড়াতেই গিয়ে বলে, ও বুড়ো দিদা, এই যে ইনি কলকাতা থেকে এসেছেন।

কোনোমতে গায়ে একখানা ফর্সা থান জড়ানো উবু হয়ে বসা একখানা কাঠ ঠকঠকে মূর্তি। রং কালো তবে এখনো বোঝা যায় মুখের কাটুনিটি ভালো ছিল। শম্পার ডাকে দরজার দিকে তাকায় বুড়ি। চোখের ওপর একখানা হাত চাপা দিয়ে আলো আড়াল করে, আর দেখেই হঠাৎ খ্যানখেনে গলায় বলে ওঠে, আ কপাল। অ্যাতোকালেও সেই মুড়নো চুলগুলো ঘাড় ছাপিয়ে পিঠ পর্যন্ত পৌঁচয়নি ?

সর্বোত্তমা থতমত খায়।

খুব পরিচিতের ভঙ্গীতে বলে ওঠা এই কথাটার মানে কী ?

তবে এনার বিষয় অনেক কিছু শুনে একটু অবহিতও আছে। তাই সাবধানে কাছে গিয়ে বলে, পা ছুঁয়ে প্রণাম করবো ?

অমা ! তুমি আবার আমায় পেন্নাম করবে কি গো ? তোমারও কী আমার মতন ভীমরতি ধরেচে ? তুমি তো দেকচি যে বয়সে ছিলে সেই বয়েসেই রয়ে গ্যাচো ! পাকা হত্তুকি খেয়ে বসে আচো বুজি ? তো পেন্নামের সম্পক্কোটা কার সঙ্গে কার ? অ্যাঁ ! তবে আমি তো সাতজন্মেও করিনি বাবা । হলে বা মান্যে বড়, বয়সে এক বচরের ছোটো না ? বয়েসে ছোটো খুড়শাউড়িকে আবার পেন্নাম করতে যাচ্ছে ।

শম্পা তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠে, অ বুড়ো দিদা। ইনি কলকাতা থেকে আসা বৌদি ।

অ্যাঁ, কী বললি ? কলকেতা থেকে আসা বৌদিদি ?

বুড়ি সেই উবু হওয়া অবস্থাতেই হাঁটু নড়িয়ে নড়িয়ে একটু এগিয়ে আসে। অর্থাৎ এটিই তাঁর হাঁটা। সরে এসে আবার চোখকে একবার আলো দেখিয়ে আর একবার আলো থেকে বাঁচিয়ে নিরীক্ষণ করে বলে, অমা ! তাই তো। কারে কী কইচি ? বটেই তো কতা ! নতুন খুড়ির এখনো এমন একখানা ছুঁড়িছুঁড়ি চেহারা থাকবে ক্যামন করে ? এই কাকভূষণ্ডির থেকে মাত্তর তো একটা বচরের ছোট ।

বোঝা যাচ্ছে—এই 'ভূষণ্ডিবুড়ি' নামটি তাঁর নিজেরই অবদান ।

বুড়ি হাঁ-করে তাকিয়ে থেকে বলে, কী অবাক কাণ্ড দ্যাকো। বিধাতার কী আশ্চর্য ছিষ্টি। সেই মুকচোক। সেই রং গড়ন। সেই বেত ডগার মতোন দাঁড়ানোর ভাব। তবে হ্যাঁ, চুলের ঘরটিতে শূন্যি ! চুল ছেলো বটে তার দ্যাকবার মতোন। মা কালী হার মানে। হাঁটুর নিচে নেবে গোড়ালি ছোঁয় ছোঁয়। এ জন্মে আর অমন চুল দেকলুম না। শুধুই কী ওই ঝাড় ? বাহার কী ? যেন কালো রেশমপশমের গোচা। তো ওই চুলই হলো 'কাল'। তোমার তেমন নাই তাই রক্ষে। এ আবার একেবারে মেমছাঁট ।

সর্বোত্তমা মাটিতেই বসে পড়ে ব্যাকুলভাবে বলে, ও বুড়োঠাকুমা ! কার কথা বলছেন বলুন তো ?

আবার কার কতা বলবো ? নতুন খুড়ির কতাই বলচি। ওই ছোটো ঘোষাল বাড়ির কত্তা আমার মহাপুরুষ জ্ঞেতিখুড়শউরের দ্বিতীয় পক্ষের

পরিবার রঞ্জাবতীর কতা বলচি। প্রেথম পক্ষ তো ছমাসের একটা ছেলে রেকে সূতিকেয় ভুগে ভুগে চাড়ি ওলটালো! সবাই বললো, আর একটা বে করো। ছেলে দেকবে কে? তখন কী হম্বিতম্বি। নাঃ। ছেলেকে সৎমার হাতে তুলে দেব না। নিজে মানুষ করবো····তো শোনো কতা, তুমি পুরুষ বেটাছেলে, তোমার কাজ নাই? কাছারি বাড়ি যেতে হয় না? তুমি একটা ছ'মাসের খোকাকে মানুষ করবে! ···তো এই বড় ঘোষাল বাড়িতে জ্ঞাতিগুষ্ঠি জ্যেঠি-খুড়ি তো ছিল বিস্তর, আর এই ভূষণ্ডি-বুড়ি তখন বে-র বছর না ঘুরতে কপাল পুড়িয়ে-বসা দস্যি একটা ডাণ্ডা খাণ্ডা বিধবা। সবাই হামরাই হয়ে চাইলো ছেলেটাকে এখন কিছুকাল আমাদের কাচে রেখে দাও।····কিন্তু না। ছেলে কাউকে ছুঁতে দেবে না। ভেন্নবাড়িতে মানুষ হলে ছেলের রীতনীত ভেন্ন হবে। আমার মনের মতো হবে না।····বললে বিশ্বাস করবে না গো! পুরুষ বেটাছেলে বাবুগেড়ে বসে ছেলেকে ঝিনুকবাটিতে করে দুধ খাওয়াতো।····বাড়িতে তো নিজের একখানা বুড়িপিসিও ছেলো, তো পিসিকে দেবে না। পিসির হাতে হাজা।····ওই করে চালালো কিছুদিন, তো বরাবর পারবে কেন? হঠাৎ একদিন শোনা গেল আবার বে করছে।

সবাই হাসাহাসি। সেই তো মান খসালি, লোকটাই যা হাঁসালি। ··· কোথাকার মেয়ে কী বিত্তান্ত, তা আগে ফাঁসও করল না। তবে পরে সবাই জানলো, কাছারিবাড়ির মুহুরির এক মা-বাপ মরা ভাগ্নী। চোদ্দ পনেরো বছর বয়েস। সে আমলে চোদ্দ পনেরোর কনে? লোকে ছি ছি দিলো! হলেও দোজবরে। তা বলে অতবড় আইবুড়ো মেয়ে! নিজে থেকেই যখন বলেচে চোদ্দ পনেরো তখন কোন না আরো দুবছর বেশি। ····এই ভূষণ্ডিবুড়ির তখন কী ছটফটানি। কেমন বৌ হয় দেকি।···· মেয়েছেলের তো দশা। দশ বচরে বিধবা হলো তো হয়ে গেল। একশো বচর ধরে টানো সেই যন্তন্নার জীবন। বাল্যবিধবার তো আবার অখণ্ড পরমাই হয়। পুরুষ ছেলের কতো সুখ। একটা গেলো তো আর একটা এলো।

সবাই বললো, কাউকে না দেকিয়ে বৌ আনচে, দ্যাকো, কেমন বৌ হয়। তো বৌ দেকে সবাইয়ের চোক ট্যারা। বুজলে কলকেতার বৌ। এই অবিকল তোমার মতন রূপ। বাড়তির ভাগ ওই চুল।····তো পিসি-বুড়ি দুম করে বলে বসলো কিনা, হাঁটুর নিচে ছাপানো চুল দুর্লক্ষণ।

সেই মেয়েমানুষের হতে কুলে কালিপড়ার ভয়! বাস! হয়ে গেল। সেই যে কতাটা মাতায় ঢুকে গেলো কর্তার তদবধি সুন্দরী রূপুসী দ্বিতীয় পক্ষের জীবনখানা অতিষ্ঠ করে তুললো। কখোন বৌ কুলে কালি দেবার তালে বেড়াচে!

সর্বোত্তমা অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে, কিন্তু ওই কর্তাটি কে?

ওমা! সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার পিতা? বললুম না, ছোট ঘোষাল বাড়ির কর্তা। সম্পক্কে আমার খুড়শউর। ও বাড়িতে যে লালকমল নীলকমল নামের দুটো ফুটফুটে ছেলে ছেলো, তাদের ঠাকুর্দা। ওদের সঙ্গে তোমার সম্পক্ক নাই? চেনো না?

সর্বোত্তমা মাথা হেলিয়ে বলে, আছে। আমার শ্বশুর।

তাই কও। 'কলকেতার বৌ' বললো, তাই মাতাটা গুলিয়ে গেচল। তো দুটোর মদ্যে কার পুতবৌ?

বড়জনের। ওই লালকমলের। উনিই এসেছেন সঙ্গে।

হঠাৎ ভূষণ্ডিবুড়ি নিজের কেঠো গালে ঠাঁই ঠাঁই করে দুখানা চড় বসিয়ে বলে ওঠে ওমা। আমি কোতায় যাবো। মট করে শউরের নামটা ধরলে? তো অ্যাখোন এই সবই ফ্যাসান হয়েচে।....তুমি তালে কী বললে? লালকমলের পুতবৌ? আহা, তোমার দিদিশাউড়িটি বড়ো ভালো মেয়ে। তো সেও তো দুটো কচিছেলে নে অকালে বিধবা হলো। কী যেন নাম ছেলো, খুব ভালো একখানা নাম। এখন আর মনে নাই। তো সে আচে? না গেচে?

সর্বোত্তমা এখন আর খপ করে নামটা বলে বসে না। শুধু বলে, কিছুদিন হলো মারা গেছেন।

ওই তো, ওই কতাই তো কই। সবাই সগগে গিয়ে ভিড় জমাতে লেগেচে আর এই যক্ষীবুড়ি আকন্ডর ডালা' মাতায় নিয়ে বসে বসে আরকাল পার করচে। চারকাল ছেড়ে পাঁচকালে পা।

তা করলেই বা। বেশ তো। চার চারটে কালকে তো দেখেছেন!

দেখে কী সুকটা হচে? তো তোমার ছেলেপুলে হয় নাই?

সর্বোত্তমা লাজুক হাসি হেসে মাথা নাড়ে, এই তো সবে কিছুদিন হলো বিয়ে হয়েছে।

অ! তো শাউড়ি নাই?

আছেন। এখানে আসেননি।

শম্পা আর হাসছে না। মন দিয়ে এই সব কথোপকথন শুনে যাচ্ছে। বোধহয় পরে হি হি করার খোরাক সঞ্চয় করতে।

ভূষণ্ডিবুড়ি হঠাৎ আচমকা বলে ওঠে, তুমি তো চাল ভাজা খেতে খুব ভালোবাসতে। খাবে দুটি? টাটকা ভাজা চাল কোটোয় ভরা আছে। ভূষণ্ডি গুঁড়িয়ে খায়। তোমার তো এখনো সেই মুক্তো পাটি দাঁত।

সর্বোত্তমার হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন ভয়ভয় করে ওঠে। গলা শুকিয়ে আসে। শুকনো গলায় বলে, চালভাজা? খেতে ভালবাসতাম?

অমা। বাসতে না? বলতে, 'মুড়ির থেকে চালভাজা ভালো।' খাবে। তালে দিই দুটি তেল নুন মেকে। কাঁচালঙ্কাও আচে।

সর্বোত্তমা ভয়ে কাঠভাবে মাথা নাড়ে।

খাবে না? এখনো সেই ভয় ভাবটা রয়েই গেছে দেকচি। বাঘের মতোন সোয়ামী। সর্বদা ভয়েই কাঁটা। আর শুধুই কী সোয়ামী? ওই পিসশাউড়ি বুড়ি? সেটি কী কম নাকী? নতুন বৌয়ের রূপগুণ দেকে বুক ফেটে মরে যেতো। ছুতোয় নাতায় ভাইপোর কানে তার দোজপক্ষের বৌয়ের নিন্দে করে বৌটাকে বকুনি খাওয়াতো। বলতো আহা! তোর প্রেথম পক্ষটি কী গুণেরই ছেলো। সাতচড়ে 'রা' ছেল না। রূপ ছেল না তো কী, নক্ষীপ্রিতিমে ছেলো। আর ইনি? ইনি হয়েচেন মাকালফল। বৌ মানুষ। একটু হায়া লজ্জা নাই।···ছাতে উঠে চুল শুকোচ্চেন বিবি। তা তো নয়, ছুতো। পড়শীরা দেকুক আমার চুলের কী বাহার।·· আমার সঙ্গে সমবয়সী তো? খুব ভাব ছেলো।····আমি অ্যাকটা জন্মো দুখী, আর ও বেচারা কপালগুণে সব থেকেও দুখী। দু'বেলা ঘাটে গিয়ে যত মনের প্রাণের কতা। ছেলের ছুতোয় বে করলো খুড়শউর, অথোচো, বৌয়ের হাতে বিশ্বাস করে ছেলে ছেড়ে দেবে না। বলে কি না সৎমা বলে কতা। বিশ্বাস কী? হয়তো কোন সময় গলাটা টিপে দেবে? নচেৎ দুধের বাটিতে বিষ মিশিয়ে দেবে?

সর্বোত্তমা উত্তেজিতভাবে বলে, পাগল ছিলেন বলুন?

গুরুজন, সগ্‌গে গেচেন, বলতে নাই তবু বলি পাগল বললে পাগল। ছাগল বললে ছাগল। শয়তান বললে শয়তান। এ বাবা। তুমি আবার কিছু মনে করচো না তো?

শম্পা হঠাৎ তেজালো গলায় বলে, বুড়ো দিদা। এত উল্টোপাল্টা কথা বলছো কেন? তোমার কোন জন্মের খুড়শ্বশুরের নিন্দেয় উনি

রাগ করতে যাবেন কেন? ও'র কী দায় পড়েছে?

বুড়ি হঠাৎ যেন নিজেকে ঝাঁকিয়ে নেয়। ফোকলা দাঁতে ফ্যাক ফ্যাক করে হেসে বলে, ওই তো। ওই তো মরণ। এই এখেনে, তো এই সেখেনে। কখন যে কাকে কী কয়ে মরি। তো এই কলকাতার বৌ। ওই আমার মহাপুরুষ খুড়শউরের সঙ্গে তোমার সম্পক্কোটা কী হলো? মাতাটা যেন গুইলে যাচ্ছে।

সর্বোত্তমা বলে, আমারও যাচ্ছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে।

শম্পা সর্বোত্তমার গায়ে একটু ইশারা সূচক ঠেলা দিয়ে যা বলে তার অর্থ এই, 'এইবার কেটে পড়ো।'

বুড়ি চালিয়ে যায়, লালকমল না নীলকমল, কার যেন বেটার বৌ হচ্চো তুমি? তালে—

ও হিসেব থাক। বলছিলাম কী, আপনি ও বাড়ির সিন্দুকটার কথা জানেন তো?

সিন্দুকটার কতা? জানি না? এই ক্ষ্যাপা মে'টা বলে কীগো। ওই সব্বনেশে সিন্দুকটার জন্যেই তো বাড়িতে ভূতের উপদ্রব।

ভূতের।

তা পাঁচজনে তো তাই বলে। ওই ছোটো ঘোষাল বাড়িতে ভূত আচে। তারা দিনমানে সিন্দুকে ভরা থাকে, আর রাতের বেলা বেইরে এসে কাঁদে, এলো চুল ঝুলিয়ে ছাতে বেড়ায়। ওই সব বাড়ি ঘর কী এমনি দুমদাম পড়েচে? ভূতের হাহাকারে পড়েচে।

আঃ। বুড়ো দিদা! থামো তো তুমি। চলুন বৌদিদি। এবার নিচে চলুন।

কিন্তু বৌদিদি ওঠার লক্ষণ দেখায় না। বলে, ওর চাবি কোথায় জানেন?

বুড়ি হঠাৎ বুড়ো আঙুলটি নেড়ে ওঠে, চাবি? নব ডংকা। ভেবে-ছিস বুঝি কিপটে বুড়োর জম্মভোর জমানো সোনাদানা টাকাকড়ি সব পাওয়া যাবে? সে গুড়ে বালি।...চাবি নাই। চাবি দীঘির জলের তলায়। ওই বন্ধ সিন্দুক আর খুলচে না।

আমি খুলবো।

সর্বোত্তমা জোরের সঙ্গে বলে, চাবি তৈরি করানো যায় না? চাবিওলা দিয়ে?

কটা করাবে সখি? হ্যা হ্যা হ্যা। ওর গায়ে সাতটা চাবি। অথোচো কোথাও ছিদ্দির দেখতে পাবে না। কাচারিবাড়ির সিন্দুকের ধাঁচে চাবি-মিস্তিরি নাকি ওর চাবি বানিয়ে-ছেলো।...এই ভূষণ্ডিও তো ত্যাখন বৌ মানুষ। হুটহাট বেরোনোর হুকুম নাই। যেটুকু স্বাদীনতা, ওই ঘাটে যাওয়ার কালে। তো নতুন খুড়ি বলেছেলো, কবে একদিন নাকি দেকেচে, ওর মদ্যে থাক থাক টাকা। তাছাড়া কর্তার আগের পক্ষের পরিবারের যতো গহনা, কর্তার মায়ের দরুন সব গহনা। প্রেথম পক্ষ বড়মানুষের ঘরের মেয়ে ছেলো। রূপে 'মা জননী' ছেলো, বাপ টাকা ঢেলে পার করেছেলো। নতুন বৌ হাড়দুঃখী ঘরের মেয়ে। বে'তে, সোনার ছিটেও জোটে নাই। তো পাঁচজনে বলেছেলো, 'আগের বৌয়ের দুখানা একখানা গহনা বার করে দাও। শুধু শাঁখা হাতে বেড়ায়।' তো কর্তা বলেছিলেন কী, এইতেই পাড়ার ছোকরাদের মাতা ঘুরিয়ে দেওয়া রূপ, আবার গহনার বাহার গায়ে চড়লে ও মেয়েছেলেকে কী আর ঘরে রাকা যাবে। ও নিজে পাচে তলে তলে বার করে নেয়, তাই চাবির ওপর সাতচাবি।...কিন্তু তিনি কী তেমনি মেয়ে ছেলো? কী তেজী। বলতো, 'ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্চি সামনে এসে দ্যাকো। আগে সেই দুধ খানিক আমি নিজে খাচ্চি।' তো কর্তা নাকী গলগলিয়ে বলতো, 'য্যাতোটুকু বিষে ধাড়ি প্রাণের কিছু হয় না. ত্যাতোটুকুতে কচি প্রাণ বিনাশ হতে পারে।'

সর্বোত্তমার যে কী হয়। ওর হঠাৎ মনে হয় ওকেই বুঝি কেউ সাংঘাতিক একটা অপমান করে বসেছে। মাথা আগুন হয়ে ওঠে। বলে, এই লোকের কোনো শাস্তি হয়নি।

বুড়ি চমকে তাকায়।

তারপর কেমন বিহবলের মতো বলে, হয়েছে, আবার হয়ও নাই। য্যাতোটা হবার ত্যাতোটা তো হয় নাই। দিব্যি ড্যাংডেঙিয়ে তো চলে গেলো। বিছানায় পড়ে গলে পচে তো মরলো না। কিন্তু তোমায় যতো দেখচি যেন হাঁ হয়ে যাচ্চি গো। অবিকল নতুন খুড়ি। তেনারও রাগ হলে হটাৎ করে চোখের মদ্যে এমনি ফসকরে ম্যাচকাটি জ্বলে উটতো। তিনিই এসে আবার জম্মো নিয়েচো না তো?

বুড়ো দিদা!

শম্পা তীব্র শাসনের স্বরে বলে, আবার তুমি বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা

বলে মানুষকে ভয় দেখাচ্ছো ? রোসো দাদুকে বলে দিয়ে তোমার মজা দেখাচ্ছি।

সর্বোত্তমাও তীক্ষ্ণস্বরে তাকে বলে, এ কী! বুড়ো মানুষকে এভাবে কথা বলছো কেন ? ছিঃ। ভয় দেখানো আবার কী ?

আপনি জানেন না, বুড়ির সবাইকে ভয় দেখানো একটা রোগ। দেখছেন তো, এত বড়ো বাড়িটায় ক'জনইবা লোক ? আমাদের দিকে তো মাত্তর দাদু-দিদা আর আমি এই তিনজন। পার্টিশানের ওধারে দাদুর একটা জ্ঞাতিভাইরা চারজন তো তাদের সঙ্গে তো, কথা নেই, মুখ দেখাদেখি বন্ধ। একতলায় এধারে ওধারে বামুনমাসি, সাবিপিসি, হরিচরণ মামা এই রকম ক'জনা। আর ছেমোবুড়ি ভর সন্ধে হলেই এমন সব কথা বলতে থাকবে, যেন পুরোবাড়িটায় লোক গিজগিজ করছে। যেন কত যজ্ঞি রান্না হচ্ছে। ডাক হাঁকই বা কী তখন—'এই অমুক, মাছগুলো কোটা হলো ? এই তমুক, ভাতডাল চেপেছে ? ·· ওই ওই বাচ্চাটা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে মাথাটা ফাটালো গো।'··· এসব ভয় দেখানো নয় ? ···আর এই যে আপনাকে কী সব বলছে! বলি ও বুড়ো দিদা বড়ো যে বলছো, 'তিনি' না কে যেন আবার জন্মেছো, এরকম দেখতে। মরে আবার জন্মালে তেমনি দেখতে থাকে ? তবে নিজে রাতদিন বলো কেন, 'মরবো মরবো করি, আবার মরার নামে ভয় করে। এ তো তবু বামুনের ঘরের মেয়ে হয়ে আছি। এরপর গরুছাগল কী শ্যালকুকুর কী হবো ভগবান জানে।' বল না।

বুড়ি আবার তেমনি হাঁটু নড়িয়ে নড়িয়ে আর একটু এগিয়ে এসে বলে, আ গেলো। এ ছুঁড়ির কী ক্যাটক্যাটানি কতা গো! যা যা! পালা তো এখান থেকে।

হ্যাঁ। আমি পালাই আর তুমি এনাকে আচ্ছা করে ভূতের ভয় দেখাও। হি হি হি। দুষ্টুবুদ্ধির রাজা।

সর্বোত্তমা এবার ওকে আরও একবার বকতে যাচ্ছিলো, সিঁড়ি দিয়ে রমার মা উঠে এলো হাঁপাতে হাঁপাতে। অ বৌদিদি, আর কতোক্ষণ এখেনে গপ্পো হবে ? ওদিকে ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ি থেকে বারবার ডাকাডাকি করছে। মেসোমশাই বলে পাঠালেন চটপট যেতে!

সর্বোত্তমা ঘাড় ফিরিয়ে বলে, আচ্ছা এখন যাচ্ছি ঠাকুমা। আমি আবার কিন্তু আসবো আপনার কাছে।

সর্বোত্তমা যেন কেমন আচ্ছন্নের মতো রমার মার সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে। নিচের দালানে মোহন ভটচাযি্যর ছোটমেয়ে ঝর্ণা দাঁড়িয়ে। বলে উঠলো, বাবা ব্যস্ত হচ্ছে। বলে 'বেলা হয়ে গেল।' কখন বা জলখাবার খাবে, কখন বা ভাত খাবে। কই? দাদা এলো না?

দাদা? দাদা মানে?

দাদা মানে? মেয়েটা ফিক করে একটু হেসে ফেলেই সামলে নিয়ে বলে, আপনার বর। এখানে আসে নাই?

সর্বোত্তমা বিরক্তভাবে বলে, এখানে? না। মোটেই না।

ওমা তাহলে? আমাদের ওখানেও তো যায় নাই। জ্যেঠামশায় ইয়ে মানে আপনার শ্বশুর তো কখোন গিয়ে বসে আছে!

দ্যাখোগে বোধহয় এখনো বাড়িতে পড়ে ঘুমোচ্ছে। বলে সর্বোত্তমা এগিয়ে যায় ওর সঙ্গে।

এই ভেবে খুব খারাপ লাগছে, লালকমল ভাবছেন, ছেলে বৌ দুজনে হাওয়া হয়ে গিয়ে বসে আছে! ডাকতে পাঠাতে হলো, কম লজ্জার কথা। একটু বিরক্ত হলো রমার মার ওপরও। বললো, বারবার ডাকতে পাঠিয়েছেন? তো তুমি তো আমায় বলনি রমার মা।

রমার মা গলার স্বর নামিয়ে বলে, ওই যে ও বাড়ির গিন্নী? এমন গপ্পো জুড়ে দিয়েছিল—

তোমার সঙ্গে আবার ওঁর এত কী গল্প? চেনা নেই কিছু নেই?

আহা, নেই বলেই তো! কলকেতার বাড়ির সব খবরাখবর নেওয়া, এই আর কী!

পথ চলতে চলতেই কথা।

সর্বোত্তমা বোঝে, আসলে একদিকে হাঁড়ির খবর সংগ্রহ চেষ্টা, অপরদিকে সংবাদদাতার উৎসাহ এই দুইয়ের যোগফলে এমন বিস্মৃতি।

ঝর্ণা বললো, এই যে এদিক দিয়ে আসুন। কালকের ঝড়ে একটা গাছ পড়ে গিয়ে পথ আটকে গেছে। ওমা! ওই তো দাদা! দিদির সঙ্গে কোথা থেকে আসছে। বুঝেছি! নির্ঘাৎ দিদি তার ইস্কুল দেখাতে টেনে নিয়ে গেছলো! ওই বাতিক। বাইরে থেকে কোনো ভালো ভদ্দরলোক এলেই, তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ইস্কুল দেখানো।

কখন বেরোচ্ছো তুমি ?

সর্বোত্তমার প্রশ্নে চমকে ওঠে পরমেশ্বর, এই তো ফেরা হলো, আবার এখন কোথায় বেরোবো ?

যাক। তবু ভালো। আজই কলকাতায় ফিরবে বলেছিলে কিনা।

কলকাতায় ! ওঃ হ্যাঁ। না মানে, ভেবে দেখলাম- বাবা যখন অত ইয়ে করলেন।

সর্বোত্তমা খুব নিরীহভাবে বলে, আমিও তাই অনুমান করছিলাম।

অনুমান করছিলে ? এভাবে কথা বলছো যে ?

কীভাবে আর ? আন্দাজ করছিলাম বাবার বারণটায় বিশেষ একটা গুরুত্ব দেবে !

পরমেশ্বর হঠাৎ রেগে গিয়ে বলে, দেওয়াই তো উচিত।

নিশ্চয়। আমিও তো তাই বলছি। খুব উচিত।

তোমার বলার ধরনে মনে হচ্ছে যেন ব্যঙ্গ করছো।

কী আশ্চর্য ! কেন ? এর আবার ব্যঙ্গের কী আছে ? যত অনিচ্ছেই থাক—বাবার নিষেধ মানবে এটাই তো স্বাভাবিক।

সর্বোত্তমা তোলা শাড়িটা ঝেড়ে ঝেড়ে পাট করতে থাকে।

তুমিও তো সকালে অজানা অচেনা একটা বাড়িতে গিয়ে খুব জমিয়ে আড্ডা মেরে এলে।

'আমিও' তো মানে ? আর কে ? ও হ্যাঁ বলতে পারো রমার মাও।

আমি কোথায় গিয়েছিলাম তা তো কই জিগ্যেস করলে না !

বাঃ। এর আবার জিগ্যেস করার কী আছে ? তোমাদের দেশ, এই প্রথম এসেছো, মাঠে বনে ঘুরে আসবে এটাই তো ঠিক।

মাঠে বনে ঘোরা হয়নি স্যার। কালকের ঝড়ে একটা গরীব ইস্কুল-বাড়ির চালা কী রকম উড়ে গেছে তাই দেখলাম।

উড়লে তো গরীবের চালাই ওড়ে। তো গরীব স্কুলের মালিক বুঝি কিছু সাহায্যটাহায্য চাইলো ?

সাহায্য ? তার মানে ?

পরমেশ্বর প্রায় ছিটকে ওঠে—সবাইকে অমন আত্মসম্মানজ্ঞানহীন

ভাবো কেন ?

এ মা ! আমি আবার কাকে কী ভাবতে যাবো ?

সর্বোত্তমা প্রায় আকাশ থেকে পড়ে, ভাবলাম, এমন তো হয়েই থাকে। বহিরাগত একজনকে ডেকেডুকে চালা উড়ে যাওয়া ইস্কুল ঘর দেখানোর ইচ্ছেটার মধ্যে এমন উদ্দেশ্য তো থাকতেই পারে।

পরমেশ্বর যেন ক্ষেপে ওঠে, কে বলেছে কেউ আমায় ডেকে নিয়ে গেছে। বেড়াতে বেড়াতে এমনি চোখে পড়লো।

ও মা ! তাই ? তা চোখেই যখন পড়লো, দিলেও তো হয় কিছু সাহায্য। অন্তত মানবিকতার খাতিরে—

পরমেশ্বর হঠাৎ অতীব ক্রুদ্ধ গলায় বলে ওঠে, ওঃ ! 'মানবিকতা'। তবে সকলকেই দয়া দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশী ভেবো না ! জেনো সেরকম 'অফার' পেয়েও সে 'অফার' উড়িয়ে দেয় এমন লোকও থাকতে পারে।

সর্বোত্তমা খুব আলগা গলায় বলে, ও মা ! তাই বুঝি ? অফার পেয়েও ? তা সত্যি ! এমন সেকেলে আদর্শবাদী বুড়োসুড়ো জাত মাস্টারজাতীয় লোক কিছু আছে এখনো সংসারে !

'সেকেলে আদর্শবাদী ! বুড়োসুড়ো মাস্টার জাতীয় !'

ভেবেছেটা কী সর্বোত্তমা !

এটা ওর অবোধ সারল্য ? না, বুঝেসুঝে কোনো জটিল প্যাঁচ ? নাঃ। ক্রমশই যেন সর্বোত্তমা নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ জানলার ওপর ঝুলিয়ে রাখা ছাড়া জামাটাই আবার টেনে নিয়ে মাথায় গলাতে যায় ?

সর্বোত্তমা বলে ওঠে, ও মা ! ও কী ? আবার গায়ে জামা চড়াচ্ছো যে ? এই যে বললে 'এখুনি ঘুরে এসেছি আর বেরোব না।'

নাঃ। খুব গরম লাগছে। গায়ে একটু হাওয়া লাগিয়ে আসি।

গায়ে না মাথায় ?

দেখো, আজকাল সবসময় এমন ঠাট্টার মতো করে কথা বল কেন বলো তো ? কোনো মানে হয় না।

সর্বোত্তমা হেসে ফেলে বলে, কিন্তু এই 'মানেহীন' ব্যাপারটাই যেন তোমার প্রাক প্রেমের কালে নাকি ছিল প্রধান আকর্ষণ। তাই তো শুনেছি, মনে হচ্ছে। এই কথার ঝংকারই নাকী 'সুর ঝঙ্কার' বলে মনে হতো। মেয়েদের মধ্যে নাকি সচরাচর এমন 'হিউমার' করে কথা বলা

শোনা যায় না। তোমার বন্ধুরা তো তাই রিপোর্ট দিয়েছে।

সে অন্যরকম। এখন যেন তোমার খেয়াল থাকে না, টন্ট' করা আর 'হিউমার' এক জিনিস নয়।

সর্বোত্তমা স্থির গলায় বলে, বলেইছি তো পরিহাস পরিপাকের ক্ষমতাটা চলে যাওয়াটা দুর্লক্ষণ।

'চলে যাওয়া!' আগে ছিল না কী?

হঠাৎ ঘরের একেবারে দরজার কাছে ধ্বনিত হয় সেই সুরেলা গলা 'পাড়ার মেয়ের'। তবে এখন আর রহস্যময়ী নয়। দুপুরে তার হাতে পরিবেশিত অন্নগ্রহণ করে আসা হয়েছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে এসেছে। হাতে একটা রেকাবি চাপা দেওয়া বড়-বাটিতে কিছু। দুহাতে ধরা।

বলে দোহাই বৌদি, বিশ্বাস করুন, আড়ি পাতিনি নেহাৎই কানে এসে গেল। যাক এটা কোথায় রাখবো বলুন? জ্যেঠামশাই তখন পায়েস খাননি, তাই নিয়ে এলাম।

সর্বোত্তমা বলে, বাবা তো 'দারুণ খাওয়া হয়ে গেছে, আর পারবো না' বলে খাননি।

তখন পারেননি, রাতে খাবেন। 'নারায়ণের প্রসাদ' বলে কথা। এখানে দেয়ালধারে রাখছি। পিঁপড়ে নেই তো?

সর্বোত্তমা একটু হেসে বলে, তা তো জানি না জানবার পরিস্থিতি আসেনি এখনো।

ক্রমশঃই আসবে।

হঠাৎ পরমেশ্বর বলে ওঠে, ক্রমশঃ! কেন, এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাস করা হবে নাকী? এরকম কথা হয়েছে?

হয়নি বুঝি? তবে যে জ্যেঠামশাই তখন বাবাকে বললেন, 'এক্ষুণি দালাল ডাকাডাকিতে কাজ নেই। বৌমার তেমন ইচ্ছে নয় ভিটে-বাড়িটা বেচে দেওয়া।'

ওঃ। তবে তো হয়েই গেল। 'বৌমা'। শেষ রায়। বলেই পরমেশ্বর বলে ওঠে, আচ্ছা, আমি তাহলে একটু ঘুরে আসি। এখন তো আর একা থাকার প্রশ্নই রইল না। পাহারাদার পাওয়া গেল যখন।

এই সেরেছে। এটাকে আবার দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা ভাবছেন কেন?

অতটা ভাবছি না। বাড়ির আর কেউ এসে যাবে। বলে পরমেশ্বর দাওয়া থেকে উঠোনে নামে।

বেহেড্ মেয়েটা বলে ওঠে, যাওয়াটা যে কেমন যেন 'পলায়ন মার্কা' দেখাচ্ছে। তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবে যখন ছন্দপতন ঘটেই গেছে, তিনজনে বসে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যেতো।

প্রলোভনটা কী তীব্র?

নাঃ। অন্য এক ধরনের বিরুদ্ধধর্মী আতঙ্কটা তীব্র হয়ে উঠেছে। এই দুটি রমণী এক হয়ে পরমেশ্বর নামের লোকটাকে নিয়ে যেন মজার খেলায় অপদস্থ করে বসবে।

কেন যে এমন মনে হলো কে জানে।

তবে তার যাওয়াটা দেখতে সত্যিই পলায়নধর্মী বলেই মনে হলো।

বেরিয়ে পড়ে নিজের ওপর খুব রাগ আসে পরমেশ্বরের। কলকাতায় চলে গেলেই ঠিক হতো। উচিত জবাব দেওয়া হতো।

কার কাছে জবাব, এবং কিসের জবাব, সেটা মাথায় আসে না।

কিন্তু ওই দুই 'রমণী' সম্পর্কে আতঙ্কটি অমূলকও নয়।

অতি প্রখরা জন অপরজনকে অনায়াসে বলে বসে, আঁচলের গিঁঠটা এত আলগা কেন? বরটি তো ঝাঁকি দর্শনেই পাড়ার মেয়ের প্রেমে পড়ো পড়ো। গিঁঠটা শক্ত রাখতে হয় তো।

কথাটা ঠাট্টা হলেও অপমানকরই। অথচ—সর্বোত্তমার বুঝতে দেরি হয় না, মোহন ভটচাযি্যর মেয়ে 'সুবর্ণা' সর্বোত্তমাকে একটু অবহিত করতেই চায়। আর ওর কথার ভঙ্গীই তো এই রকম। তা নইলে দিব্যি সকলের সামনে বলে বসে কিনা, 'বুড়োকর্তা সগগে যাওয়ার পরে অভাগা নারায়ণ বোধহয় এই প্রথম পায়েসের মুখ দেখলো, তাই না বাবা? তাও আবার অতি উত্তম—গোবিন্দভোগ চাল, আর সত্যি দুধের।'

মোহন রাগের চোটে তোতলাতে তোতলাতে বলে, 'সত্যি দুধের' মানে? অ্যা? দুধের আবার সত্যি মিথ্যে কী?

বাঃ। একঘটি জলে এক চামচ দুধ ঢেলে দিলে সেটা প্রায় দুধ দুধই দেখতে লাগে বটে তবু তাকে তো আর 'সত্যি' দুধ বলে না।

সর্বোত্তমা তাই অপমানকে গায়ে না মেখে অবহেলার ভঙ্গীতে বলে, যদি আঁচলের গিঁঠ শক্ত করার প্রশ্ন ওঠে, তাহলে বরের সঙ্গে বর্বরের

তফাৎ কোথায় ? আর তফাৎ যদি না থাকে সে জিনিস আঁচলের গিঁঠ খুলে পড়ে গেলেই বা কী ?

ওরে বাবা। দারুণ দিলেন তো একখানা। তাহলে আর সাবধান করে দেবার দরকার নেই। কী বলুন ?

আমি কিছুই বলি না। যা থাকবার তা থাকেই। আর যেটা থাকার নয়, তাকে ধরে রাখার চেষ্টাটা হাস্যকর, এইটাই বুঝি।

বৌদি।

কী ?

আমার যে আবার উল্টো জ্বালা হলো দেখছি। আপনাকে যতই দেখছি, ততই যে আপনার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি গো।

সর্বোত্তমা ওর কথার ধরন শুনে হেসে ফেলে। আর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। নাকমুখ চোখ কী শাস্ত্রীয় নিয়মে 'ফার্স্ট ক্লাস' পায় ? হয়তো সে হিসেব ধরলে পায় না। তবে রঙে সত্যিই 'হেম গৌরাঙ্গী' ? সন্ধ্যার আবছা ছায়া পড়ে এসেছে, তার মধ্যে রংটা যেন জ্বলছে। আর সেইজন্যেই নিখুঁৎ না হলেও সবটা মিলিয়ে অনবদ্য। আর বাড়তি একটা প্রখরতা থাকা বাবদ পরম আকর্ষণীয়া। প্রখরতাও একরকম আকর্ষণীয় বৈকি।

সর্বোত্তমা মৃদু হেসে বলে, তাতে আর আপত্তির কী আছে ? যত দূর ইচ্ছে পড়া যায়। বদনাম হবার ভয় তো নেই। তবে ভাবছি—এমন একখানা মারকাটারি 'পাড়ার মেয়ে' এখনো পাড়ায় পড়ে রয়েছে কেন ? ভিনপাড়া থেকে লুঠ হয়ে যায়নি কেন ?....আর যায়নি যখন তখন 'পাড়ার ছেলে' বলে যে একটা জাত আছে তারা এমন ভ্যাবলা হয়ে বসে আছে কেন ? নাকি এখানে 'পাড়ার ছেলে' বলে কিছু নেই ?

ও বাবা ! নেই আবার ? ইঁদুর, ছুঁচো, হুলো বেড়াল, নেড়িকুকুর, আবার পৃথিবীর কোন দেশে নেই ? তবে স্থান বিশেষে হয়তো চেহারায় তারতম্য আছে। তবে কী জানেন ?

হি হি করে হেসে ওঠে সুবর্ণা। বলে, এরাই হচ্ছে সবথেকে ভীরু কাপুরুষ। একদিন একটাকে বলেছিলাম, ধারে কাছে বেশি আসতে চেষ্টা করলে, 'বাপের নাম খগেন করে ছাড়বো'। তো ভাবলাম পরে বোধহয় দলবল নিয়ে অপমানের শোধ নিতে আসবে। হরেকেষ্ট। তার-পর থেকে আর তার টিকিটিও দেখতে পাইনি। আর একদিন একটা

লক্ষ্মীছাড়া বেশি মস্তানি করতে এসেছিল, বলেছিলাম, 'এক থাপ্পড়ে মুখের জিওগ্রাফি বদলে দেব।' সেও তদবধি নো পাত্তা। তো ভেতরে ভেতরে বোধহয় 'প্রচার কার্য' চলেছিল কিছু। তারপর থেকে আর কেউ দিক ঘেঁষতে আসে না। কিন্তু আশ্চর্য তার পরবর্তী ইয়ে—প্রজন্মই বলি 'অতি সভ্য'। 'দিদি' ডাক ভিন্ন কথা বলে না, অতি সমীহ সম্ভ্রম করে।…

সর্বোত্তমা একটু হেসে বললো, শুনে ভালো লাগলো। তা জন-সমাজে কী নাম চালু? 'রণচণ্ডী' না 'মহিষমর্দিনী'?

খুব সম্ভব। অন্তত বাড়িতে তো ওই খেতাব জুটে বসে আছে।

সর্বোত্তমা বলে, তবে বলি, বাবাকে আপনি একটু বেশি—

বৌদি! আবার 'আপনি'? কী বলেছিলাম তখন?

বাঃ, নিজেও তো তাই চালানো হচ্ছে।

সে তো একশো বার হবে। কিসে আর কিসে। আমি তো একটা মায়ে তাড়ানো, বাপে খ্যাদানো 'পাড়ার মেয়ে' মাত্র। আর আপনি? গুরুজন। একজন মান্যগণ্য লোকের মিসেস। দুজনের দুরকমই চলবে।

তা বেশ চলুক। তো পাড়ার ছেলেদের হিস্ট্রী তো জানা গেল, বে'পাড়ার? লুফে নেবার মতো এমন একখানা সুন্দরী মেয়ে কারুর চোখে পড়ে না?

সুবর্ণা মুখ চোখে ঘোরালো ভাব এনে বলে, তাতেও কসুর নেই। শ্রীযুক্ত মোহন ভট্চাযও চেষ্টার ত্রুটি করেন না, যখন তখনই একখানা করে পাত্রপক্ষ যোগাড় করে এনে ঘোষণা দেন, 'রাজকন্যেটিকে একটু ঠিক থাকতে বোলো, আজ ওখান থেকে দেখতে আসবে।'….তারপর আর কী? তারা ভয় পেয়ে সরে পড়ে।

খুব ভয় খাইয়ে দাও?

তা একটু দিতেই হয় বৌদি। ওইটাই তো আসলে হাতিয়ার। নিজেকে বুঝে নিয়েছি, বিয়ে হয়ে বৌগিরি করে জীবন কাটানো আমার পোষাবে না। তবে হ্যাঁ তেমন 'বাঘা গোছের যদি কেউ জোটে, ভেবে দেখতে পারি।

বাঘাই পছন্দ? শক্তিমানের বশ্যতাই কাম্য?

'বশ্যতা!' এ মা! তা কেন? একটা 'বাঘা'কে হাতে পেয়ে দেখাতে

ইচ্ছে 'ঢিট' করা কাকে বলে। চিরকাল যাবৎ মহাপ্রভুরা প্রভুত্ব করে এসেছেন, একটু পালা বদলের নমুনা দেখলে কেমন হয়? ···এই যে এই ঘোষাল বাড়িতে বাজার চালু কিংবদন্তী—যিনি না কি এখনো এই পড়োবাড়ির আনাচে কানাচেয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বেড়ান, গুমরে গুমরে কেঁদে মরেন তিনির কাহিনী শুনলেই আমার মাথায় খুন চেপে যায়। মনে হয়. ইস্। ওনার জায়গায় যদি আমি হতাম। তাহলে সেই ঘোষালকর্তাকে বুঝিয়ে ছাড়তাম নাকে ঝামা ঘষা কাকে বলে। কিন্তু তখন যে ছাই জন্মানোর স্বপ্নও দেখছি না।

সর্বোত্তমা হঠাৎ দুরন্তভাবে কেঁপে ওঠে।

সর্বোত্তমার মাথার মধ্যে একটা ওলটপালট তোলপাড় ওঠে। প্রায় স্খলিত স্বরে বলে, তুমি তার কাহিনী জানো?

জানি, মানে ওই কিংবদন্তীতে যতটুকু যা জানা যায়। তো বলাটা বোধহয় ঠিক হলো না? তিনি তো আবার আপনাদের পূর্বপুরুষ। নাঃ সত্যি, আমার কাণ্ডজ্ঞানের অভাব আছে।····ওই, ওই আপনার কাজের লোকটি জল নিয়ে ফিরলো এবার উঠি। না না। যাই।

সর্বোত্তমার চেহারাটাই যেন পাল্টে যায়। ব্যাকুলভাবে সুবর্ণার একটা হাত চেপে ধরে বলে, তোমার এখন ওঠা হবে না। বলতে হবে আমায় সেই কাহিনী।

এই সেরেছে। আমি কী আর ঠিক জানি? মূল গায়েন তো হচ্ছেন ওই বাড়ির ভূষণ্ডিবুড়ি। আজ তো গিয়েছিলেন তার কাছে। বুড়ি বলেনি কিছু?

সর্বোত্তমা আবার সেই সকালের মতো আচ্ছন্ন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ছায়া ছায়াভাবে বলে, বলেছেন।

বাঃ। তাহলে তো শোনাই হয়ে গেছে।

না, বেশি কিছু বলেননি, শুধু আমার সঙ্গে তাঁকে গুলিয়ে ফেলে বলেছিলেন, 'তুমি তো চালভাজা খেতে ভালোবাসো। খাবে দুটি?'

ও। তার মানে ভীমরতিটা আবার জোর কদমে চেপেছে।

উনি বললেন, আমি নাকি অবিকল সেই 'তিনি'।

সুবর্ণা সর্বোত্তমার মুখ চোখের ভাব দেখে একটু আশ্চর্য হয়, একটু শঙ্কিতও। তাই সহজ হবার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি বলে, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ওরকম এক একটা কথা বলে বসে বুড়ি।····একদিন নাকি কোন

একটা বুড়িকে বলে উঠেছিলেন, 'আ গেলো ! এই পাতুকী বুড়ি গাছ-চাপা পড়ে মরেও আবার জীইয়ে উঠেছে যে ! নরকেও ঠাঁই হয়নি বুঝি ? ....আবার বলে কি—'সম্পর্কে গুরুজন। তো বয়েই গেল। পাপিষ্ঠি পাতুকীকে কে আবার মান্য করতে যাচ্ছে ? তাকে আরো কত দুরছাই ! গালমন্দ। ...সে বুড়ি তো শুনে হাঁ। পাগল ছন্ন অবস্থা। তবে হঠাৎ হঠাৎ দিব্যি সহজ কথাও কয়। আসলে বুড়ি সারাদিন বোধহয় সারা-রাতও একা একাই কথার চাষ চালায়। যারা আছে, আর যারা কোনকালে মরে ভূত হয়ে গেছে তাদের সক্কলকে এক হাঁড়িতে চাপিয়ে চচ্চড়ি বানায়। · তবে মাঝে মাঝে ওর স্মৃতিচারণ থেকে এক একটা গপ্পো পাওয়া যায়।....অনেকটা যেন জঞ্জালের স্তূপ থেকে কোনো ছেঁড়া কুচি-কুচি চিঠির টুকরো হাতড়ে খুঁজে তাকে জুড়ে জুড়ে আস্ত করে তুলে পাঠোদ্ধার। · এবার কিন্তু যাই বৌদি। ওই যে আপনার রমার মা হ্যারিকেন জেলেছে।....ও মা, ওই তো জ্যাঠামশাইও এসে গেছেন। ও জ্যাঠামশাই, সকালে প্রসাদী পায়েসটা খাননি, রেখে গেলাম। খাবেন কিন্তু।

....

আচ্ছা, বুড়িটা কে ?

কোনখানে যেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটা দাঁতালো জন্তুর মতো হিংস্র চেহারার বুড়িকে। ...উঠোনে ঘুরে ঘুরে নিমের ডাল নিয়ে দাঁতন করছে আর একটা গাছতলায় 'থু থু' করে থুথু ফেলছে।....কোথা থেকে যেন ভিজে কাপড় শপ্‌শপিয়ে চান করে আসছে কোমরে ছোট একটা ঘড়া নিয়ে। বারবার। কোথায় যেন বসে একটা ধারালো বঁটি নিয়ে কী যেন কেটে কেটে স্তূপাকার করছে। আর....আর একটা হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ঘরের মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরো নিয়ে সরু সরু করে সলতে পাকিয়ে চলেছে ডাঁই করে।....কিন্তু ওটা তো হাতে, মুখচোখ ঘুরিয়ে কাকে কী যেন বলে চলেছে।

কাকে ?

সামনে পাতা একটা উঁচু চৌকির ওপর বসে থাকা একটা লোককে না ? লোকটার মুখটা কী হাঁ করা বাঘের মতো ?....না তো। অতি সুকান্তি সুপুরুষ একজন তো। তার কোলের কাছে একটা ঘুমন্ত

ছোট ছেলে। খুব স্নেহে আর সন্তর্পণে তার গায়ে হাত বুলিয়ে চলেছে।....

তাহলে? ওই হাঁ করা বাঘ মুখ? একটা....দুটো....তিনটে....

ওঃ। ওটা ওই উঁচু চৌকিটার মোটা মোটা পায়ার নিচের খুরো-গুলো। .. শখের নক্সা।

কিন্তু ওই বাঘমুখগুলো সর্বোত্তমা এক্ষুণি কোথায় যেন দেখল।

বাবা!

লালকমল সচকিত হয়ে বলেন, ফিরতে দেরি দেখে বুঝি মায়ের রাগ হয়েছে? কথাই নেই। আসলে কী জানো—ভট্‌চায্যি একটা লোককে ডেকে এনেছিল—

বাবা! ওই হাঁ-করা বাঘমুখ পায়া চৌকিদের আপনি দেখেছেন?

বাঘমুখো পায়া চৌকি?

লালকমলের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে, ভটচায্যির বাড়িতে তো? দেখিনি আবার?...দেখে ছেলেবেলায় ভয়ে ভির্মি খেতাম।.... আসলে কী জানো বৌমা, অকারণেই গলার স্বর নামান লালকমল, ওই বৃহৎ চৌকি দুটো এবাড়িরই। .. এখানে পড়ে থেকে উইয়ে খাবে বলে, ওবাড়িতে নিয়ে গেছে। ভালই করেছে ছেলেপুলে শুচ্ছে ভোগ হচ্ছে। ....একালের ছেলেপুলে ভয় খায় না। আমি আর নীলু ওই হাঁ করা মুখগুলো দেখে ছেলেবেলায় কী ভয়ই পেতাম।....

সর্বোত্তমা আস্তে বলে, আমিও। ভীষণ ভয় পেতাম। মনে হতো ওগুলো যেন কাঠের নয়, রক্তমাংসের। এক্ষুণি এগিয়ে এসে কামড় দেবে।

লালকমল বলে, 'পেতাম' বলছো কেন? ভয় পেয়েছ বলো? তো তুমিও? হা হা হা। এত বড়ো মেয়ে। এত সাহসী মেয়ে।....কে? পরম এলি?...এখানে অন্ধকারে রাতে বেড়াতে যাওয়া কেন বাবা? এ কী তোর কলকাতা পেয়েছিস?....এইসব ভাঙা ইঁটের গাদার খাঁজে খাঁজে হয়তো সাপখোপ ব্যাং বিছে ঘুরছে।....

ও আমার কপাল! তুমি আবার এসেছো?

খলখল করে হেসে ওঠে বুড়ি, দীর্ঘদিন দাঁত হারানো ফোকলা বুড়িরা যেমন করে হেসে ওঠে। হ্যাঁ, বুড়িরাই। বুড়োরা কখনো এভাবে হেসে ওঠে না।....হেসে উঠেই আবার বুড়ি গলার স্বর নামিয়ে ভয় ভয়

চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, এলে, কেউ দেখতে পায় নাই তো ? পেলেই এক্ষুনি কুচুটে বুড়ির কাছে গিয়ে 'কুটুস করে' নাগিয়ে দেবে। চান্দিকে শত্তুর, শত্তুরপুরীর মদ্যেই তো বাস। গোয়েন্দার চর নাগিয়ে রেকেচে। আর ওই হারামজাদী নাগানিভাঙানিরা ? নিজেদের কোনো স্বার্থসিদ্ধি নাই, তবু নাগিয়ে দেবে। কারণের মদ্যে হিংসে। ওই যে অ্যাকটা মা-বাপ মরা গরীবের ঘরের মেয়ে এসে রাজ্যপাটের ওপর বসেচে। তাতেই সব বুক জ্বলে যাচ্চে। আর ওই শয়তানী বুড়ি ? ভেবেছিল আগের পক্ষের নিরীহ ভালোমানুষ বৌটা যেমন অকারোণ ভয়ে পিস-শাউড়ির পা পুজো করতো, নতুন বৌটাও বুজি তাই করবে। গরীব দুঃখী ঘরের মেয়ে ডোমের চুপড়ি ধুয়ে এসে সোয়ামীর ঘরে ঢুকেচে, সেই লজ্জায় মরমে মরে সর্বদা নত হয়ে থাকবে।...তা তো হলো না। বৌ সে এসটাইলেরই না। সব্যো ভদ্দোর শান্তো, মুকে চোপা নাই, কিন্তু যেন চাবুক হেন। নুইতে জানে না।...তাতেই আক্রোশ। ছোটো-নোকবুদ্দিরা চায়, অন্যেও ছোটোনোক হোক, ঝগড়াকোঁদল করুক। তাতেই শান্তি। অপরে ভদ্দর হলেই চক্ষুশূল।...

সর্বোত্তমা সেদিনের মতো মাটিতেই বসে পড়েছে। আজ আর বুড়ির অঙ্গে 'বারাণসী শাড়ির' আবরণ নেই। তার নিজস্ব পরিধানই সম্বল।...চারিদিকে নানা রকমের জিনিস ছড়ানো। টিনের কৌটো, কাঁড়ির কৌটো, বিচিত্র গড়নের ও মাপের—সব শিশি বোতল, ন্যাকড়া-বাঁধা ছোটো ছোটো পুঁটুলি।

ও ঠাকুমা, বুড়ি কে ?

কে আবার ? ওই পিসশাউড়িটি। নরকেও যার ঠাঁই হয় নাই। সর্বদা ভাইপোকে বিষমন্তর দিয়েচে। একে সন্দবাতিক বাঘা পুরুষ, তাকে যদি কেবলই শোনাও, 'বৌয়ের রীত চরিত্তির বুজি না বাবা। হায়া নাই লজ্জা নাই। ঘাটে পতে যায় ঘোমটা দেয় না—' তাতে বাঘ আরো ক্ষেপে যাবে কিনা ? বৌটাকে আরো খোয়ার করবে কিনা ?.... দেকে শুনে মনে হয়েচে অকালে কপাল পুড়েচে, না বেঁচে গেচি। একটা দুম্বো পুরুষ যে রাতদিন বুকের ওপর দুর্মুষ পিটবে, আর বলবে, 'এই তোর শ্যাঁখা সিঁদুরের দাম উসুল করচি, 'এই তোর ভাতকাপড়ের দাম উসুল করচি। এই তোর আছ্রয় পরিচয়ের দাম উসুল করচি—' সে কী কম অসহ্য ?....তা বেওয়ারিশ মালটাকে

অবিশ্যি পাঁচজনে ছ্যাঁচে। তা তো ছেঁচবেই। মানুষের স্ববাবই তো হলো, বেওয়ারিশ দেকলেই হাতের সুক করে নেওয়া। আর এই ভূষণ্ডি বুড়ি? তার পোড়া কপালে তো আরো ছেঁচুনি জুটবেই। দশ বচর বয়েসে বে, দশ বচরের মদ্যেই কপালপোড়া। শাউড়ি বললো 'অপয়া অলুক্ষুণে মেয়ে দূর করে দাও।'····তো দূরটা করবে কোতায়? সেখেনে যে মা ভবানী'। ডাক পেয়ে মামা এসে বললো, বহুকষ্টে গলার কাঁটা উদ্ধার করে ফেলেছিলুম, আবার সেই কাঁটাকে কুড়িয়ে গলায় তুলবো? পাগল তো নই। আপনাদের ঘরের বৌ, মারতে ইচ্ছে হলে মারবেন, কাটতে ইচ্ছে হলে কাটবেন, ঘর থেকে বার করে দিতে ইচ্ছে হলে দেবেন। আমি এই সেলাম ঠুকে বিদেয় নিচ্চি।' ··তো হি হি হি মারা কাটা তো সোজা নয়। থানা পুলিশের ভয়, আর ঘরের বৌকে বার করে দিলে ঘরের কেলেঙ্কারি, অগত্যে ঘরে রাকো। একটা অবোদ বালিকাকে দিয়ে তিনটে মুনিষের খাটুনি খাটাও আর সবাই মিলে ছ্যাঁচো। তো সে মেয়েও তেমনি ঘুঘু। হি হি হি। অতো দুর্দশাতেও একশো বছর ধরে ঘোষালবাড়ির অন্ন ধ্বংসাচ্চে।···তো মিথ্যে বলবো না, পরে আর দুর্দশা থাকে নাই। মাতার ওপরকার লোকগুলো ফর্সা হয়ে যাওয়া অবদি—শান্তি। পরের কাল মান্যভক্তিই করেচে। এখনো করচে।···· এইজন্যেই বলে, 'যে সয়, সে রয়। তা তুমি তো বাপু—

সর্বোত্তমা উৎকণ্ঠিত ব্যাকুলতায় বলে, ও ঠাকুমা। সেদিনের গল্পটা শেষ করবেন বলেছিলেন যে?

অ্যাঁ? কে?

বুড়ি যেন অন্য জগৎ থেকে ফিরে আসে, অ! সেই কলকাতার বৌ? তো কলকেতায ফিরে যাওয়া হয় নাই এখনো?

না। ফিরে যাবো কেন? আমাকে তো সব শুনতে হবে, আর সিন্দুকটা খুলে দেখতে হবে।

দেকতে হবে? দেকে আর কী করবি ছাই?

তা জানি না। তবু দেখতে চাই।

হুঁ। তালে কাচে আয়, চুপিচুপি বলি। চাবিটাবি কিছু নাই সব ছলকৌশল। ওই যে পেতলের গুলি মারা মারা আচে? দেকে মনে হয় শুদু বাহার, ওইগুলোই হচ্চে ইসকুরুপ। পাক খাইয়ে খাইয়ে খুলে ফেলতে পারলেই—

অ্যাঁ !

চুপ। চুপ। বলিস না কাউকে। নতুন খুড়ি আমায় দেকিয়েচিলো অ্যাকদিন। বুড়ি গিয়েচিলো ত্রিবেণীতে গঙ্গাছ্যানে, কী যেন 'যোগে', আর খুড়ো ত্যাখন কাচারিতে। ঘাটের পথে আমায় চুপিচুপি ডেকে নিয়ে গিয়ে বললো, 'দেকবি আয় অ্যাকটা মজা।'…দু'জনায় সম্পর্কে শাউড়ি-বৌ হলে কী হবে, খুব ভাব ছিল তো, বন্ধুর মতোন। তাই দুজনায় তুই তোকারি করেই কতা।…বললো, 'দ্যাখ কেমন চোর ঠকানো কল-কব্জা। তোদের খুড়োর মাতার মধ্যে কেবল ওই কলকব্জার প্যাঁচ।'… হাসাহাসিও করেচি দুজনায়। তবে সবই লুকিয়ে। তা নইলেই গিন্নীরা বলবে 'কাজ ফেলে অ্যাতো গালগপ্পো কিসের অ্যাঁ?'…ভরদুপুরে ঘাটে গিয়ে দুজনায় বুকের নিচে খালি কলসি ভাসিয়ে সাঁতার দিতে শিকতুম।…তো আমার তো কোনো বালাই নাই, বেটাছেলের মতোন করে চুল ছাঁটা, একবার গামছা ঘসলেই হয়ে গেল। আর তার? তার তো সেই চুলের ঢাল। মুচে মুচে আর বাগে আসে না। তো তেমনি একদিন ঘাট থেকে উটে গাচতলায় দাঁড়িয়ে চুলে ঝাড়ো দিয়ে দিয়ে মুচচে, হটাৎ দেকি সামনে যম। বাস চোকে অন্দোকার। মাতায় বাজ।

যম। যম মানে?

যম মানে? যম মানে ওই খুড়োশউর। বোধহয় সন্দবাতিকে হটাৎ টনক নড়িয়ে হুট্ করে বাড়ি চলে এয়েচে। এসে দেকে বাড়ি খাঁ খাঁ। পিসি তো দুপুরটি হলেই পাড়া বেড়াতে যায়, গ্যাচে। পরিবারও নাই। বাসনমাজুনি বাগদি বৌ গোয়ালের সামনের চাতালে পড়ে ঘুমোচ্চে। দেকে মাতায় রক্ত চড়ে উটেচে। ছুটে এয়েচে খিড়কি ঘাটে।

* সর্বোত্তমা আস্তে বলে একটা ছোট ছেলে ছিল না?

তা তো ছেলই। তো তারে কী ঘরে কারো কাচে রেকে যেতে বিশ্বেস ছেলো? সঙ্গে সাতে করে নে যেতো। ন্যাবনচুষ হাতে ধরিয়ে বোস করিয়ে রাকতো, ঘুম ধরলে কাচারি ঘরেই শুইয়ে দিতো। ফেরার সময় উটিয়ে নে এসতো। ছোটোকাল থেকেই এই ব্যবস্থা। ত্যাখন তো তবু একটু ডাগর হয়েচে।…তো ছেলেটার হাত ধরেই ইতিউতি দেকচে, ছেলেটাই চেঁচিয়ে উটলো, ও বাবা। ওই তো মা!…বাস। তারপরে যা ঘটলো। বললে পেত্যয় যাবে না কলকেতার বৌ, সেই এলোচুলের মুটি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নে যেতে যেতে বলে, 'অ্যাঁ? ভরদুপুরে ঘাটে

পতে এসে পরপুরুষের সঙ্গে লীলা খেলা চলে ?'....আমার তো দেকে-শুনে হয়ে গ্যাচে। ভেজা শপশপে থান গায়ে সেঁটে আচে, টেনেটুনে ঘোমটা দিতে গিয়ে পিট বেরিয়ে যায়।...ছুট মারবারও উপায় নাই, পায়ে পায়ে জড়াবে। একখানা গাচের আড়ালে গে চক্ষু মুদে ভয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপিচি ..কানে আসচে, ছেলেটা চেঁচাচেচ 'ও বাবা মায়ের চুল ছেড়ে দাও না। মায়ের যে লাগচে।' আর সিংহী হুঙ্কার দিচ্চে, ছেড়ে, দেব ? দ্যাক আজ ওর কী করি ? ...'

বলতে বলতে বুড়ি হঠাৎ আবার এলোমেলো কথা বলতে শুরু করে। না থাকে খেই, না থাকে পারম্পর্য।

তার মানে সেই সুবর্ণার ভাষ্য।

কুচিয়ে ছেঁড়া চিঠিখানার টুকরোদের কুড়িয়ে জড়ো করে নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে পাঠোদ্ধার।

হ্যাঁ তা বেভ্রম আসতে পারে। চেরকালই তো কেলে হাড়গিলে তেঠেঙে তালগাচ।...যৈবনেও একই দিশ্য। তো ছাঁটা চুল, ন্যাড়া হাত, পরনে শাদা ন্যাকড়া। বেটাছেলে বলেই ভ্রম হয়। তবু বৌটা যাখন বলচে, 'সন্দোয় অন্ধো। তাকিয়ে দেকেচো, কে অ্যাখোন পড়ি মরি করে ছুটলো—' ত্যাখন দ্যাক, ..গুরুজন সম্পক্ক, মরে গিয়ে নরকে গ্যাচে, তবু না বলে পারা যায় না, না দেকে শুনে তুই বাঘ গর্জন ছাড়চিস.... 'বড়বাড়ির ভাসুরপো বৌ। বাঙালকে হাইকোর্ট দ্যাকাতে এয়েচো ? ভূতের কাচে মামদোবাজি ? দেকাচ্চি ভালো করে'।....দেকাতে তো গেলি ? কী হলো ? তুই তার কী কলাটা করতে পারলি ? সে তো তোর নাকে ঝামা ঘষে, দুয়ো দে চলে গ্যালো। অ্যাখোন কী করবি কর ? আরো অ্যাকখান বে করবি ? ছেঁচতে কুটতে দাওয়ার খুঁটোয় বেঁদে দাঁড় করিয়ে রেকে জোড়া পায়ে লাথি মারতে ? তো করলেই পারতিস। কে বাদা দিতো ? এই নক্কীছাড়া দেশে মেয়ের কী আর অবাব ছেলো ? তো বাদ সেদে ছেলো বোধহয় ওই নিকষাবুড়ি। যে বুড়ি ভাইপোর সংসারে আদিপত্য বজায় রাকতে অ্যাকটা বৌকে দাপটের চোটে কেঁচো করে রেকে শেষতক তুকতাক করে, শরীলে ব্যামো ঢুকিয়ে মেরেছিলো, আর অ্যাক-টাকে 'কেঁচো' করতে পেরে ওটোন বলে, তার সোয়ামীর কানে বিষ মন্তর দিয়ে দিয়ে ভাঙিয়ে—বিষনজরে ফেলে খতম করে ছাড়লো।....তো তুইও

গুরুজন, অগ্রে নমোস্কার করেই কইচি, তোরই বা এতে কী লাব হলো? পাপের শাস্তি পেলি না ? ঝড় না দুর্যোগ না, ভরদুপুরে হটাৎ করে অ্যাকখান ঝোড়ো বাতাসের ঠ্যালায় গাচ চাপা পড়ে মরলি না ?…তো বেড়ালের প্রাণ, কাটপ্রাণ। আবার জীইয়ে উটে ঘুরে বেড়াচ্চিস। হ্যা হ্যা হ্যা। কী মহোৎ কম্মো করে পেটের ভাতটি জোটাচ্চো ? না, গোবর কুড়িয়ে কুড়িয়ে ঘুঁটে দে। হুঁ বাবা ধম্মের কল বাতাসে নড়ে।…আর যে সত্যিকার ভালো মেয়ে সতী মেয়ে ছেলো, তাকেও দ্যাক ? এসে দাঁড়ালো যেন চারদিক আলো করে।

বুড়োদিদা তুমি চুপ করবে ?

ক্যারে ? সেই কটকটানিটা বুজি ? ক্যানো রে ? চুপ করবো ক্যানো ? অ্যাঁ ? তোর পাকা ধানে মই দিচ্চি ?

পাগলের মতোন কী সব বকচো আবোলতাবোল। গলা চিরে যাচ্চে যে।

ওমা। ওমা। আমার 'হিতুষী, সই আতুসী। আমার গলা চিরে যাচ্চে, সেই দুঃখে তোর বুক চিরচে ? …যা পালা এখেন থেকে। আর না পালাস তো ওই নিকষাবুড়ির আস্‌ফালাদি ফোঁসফোঁসানি শোনগে যা। ওই তো বড় দালানে এসে বসে হাতমুখ নেড়ে চেঁচাচ্চে, ওনার পরিবারের স্বভাব চরিত্তির মন্দ, তার জন্যে আমি দায়ী ? অ্যাঁ…আমারে এই মার তো সেই মার। বলে 'কিনা ঘরের বৌ ভরদুপুরে ঘর থেকে বেইরে গে কোতায় কী করে বেড়ায় তা দেকতে পারো না ? বুড়োগিন্নী নিত্যদিন পাড়া বেড়াতে যাওয়া চাই ? প্রাণে এতো শক ?'…শোনো সবাই অন্যাই কতা। আমি সকাল হতে ইস্তক খাটবো-খুটবো, একবার একটু হাঁপ ফেলতে যেতে পারবো না ? তোর দুর্মতি দুর্বুদ্ধি পরিবারকে পাহারা দিতে ঘরে বসে থাকবো ?…বৌ তো না, যেন ফণা-ধরা ফণিনী। দেখলে বিষ ওটে।…হি হি হি তেমনি জব্দো হয়েচেন আজ মহারাণী। কেশ ধরে টেনে এনে সেই কেশ দিয়েই দাওয়ার খুঁটিতে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেকেচে। তিন হাত লম্বা চুলের ভারী গোচা, গরুবাঁদা দড়ির মতোন কাজ দিয়েচে। দ্যাকোগে না গিয়ে ? সে এক রগড়ের দিশা। তা' চোকদে কোতায় জল ঝরবে তা না চোকে যেন আগুন ঝরচে। যেন পিথিমীটা ভস্ম করে দেবে।…বলি—একী সেকালের মুনিঋষি ? তাই চোকের আগুনে ভস্ম করে দিবি ? অতো

সোজা না।· তো তিবু আমার দোষের কিছু বলে নাই। শুদু বলেচে অ্যাকবার মাপ চা। বল, আর কখনো অ্যামন কাজ করবো না। বাঁদন খুলে দেব।' বলচে, 'না। কাট গোঁয়ারের মতন দাঁড়িয়ে আচে।'.... শুনতে পাচ্ছিসনে খ্যানখেনে বুড়ির ভাঙা কাঁসির মতোন গলা।

ধ্যাৎতেরি। ও বুড়োদিদা। ওসব তো অনেক কালের কথা। এখন আবার শুনতে পাওয়া যাবে কী? তোমার ও গপ্‌পো তো আমাদের অনেকবার শোনা। আবার কেন বকবকাচ্ছো?

ফের! ফের ওই আসপর্দার কতা? বকবকাচ্চি? বলি তোদের তো শোনা, এই কলকেতার বৌয়ের শোনা, হ্যাঁলা শুনেচিস?

কলকেতার বৌ কেমন একটা ঘোরলাগা চোখে তাকিয়ে আস্তে নেতিবাচক মাথা নাড়ে।

তবে? বলি তবে?

খরখরানি মেয়েটা বলে ওঠে, তা আমিই শুনিয়ে দিচ্ছি। বাড়ি থেকে ডাকাডাকি করতে এসেছে। তোমার তো সবটা বলতে এখন দু'ঘণ্টা ধরে পাঁচালি চলবে। তারপর কী হলো জানেন বৌদি, সেই কর্তাতো নাকি কিছুতেই মাপ চাওয়াতে না পেরে, 'থাকো তবে সারা-রাত্তির উপোস করে খুঁটিতে বাঁধা হয়ে'—বলে ছেলেকে নিয়ে খেয়েদেয়ে শুতে চলে গেছে।

সকালবেলা উঠে এসে দেখে পাখি ফুড়ুৎ।....হি হি হি বুড়োদিদা তো তাই বলে। পাখি ফুড়ুৎ।

সর্বোত্তমা রুদ্ধকণ্ঠে বলে, দাঁড়িয়ে থেকে মারা গেছেন?

না না। সেখানে মারা যায়নি। সকালে সবাই দেখে হাঁ, খুঁটির গায়ে চুলের গোছা জড়ানো, মানুষটি নেই।

কী করে? অ্যাঁ?

বুড়োদিদা বলে, দাওয়ার ধারে দেয়ালে নাকি পেরেকে দড়ি বেঁধে ঝোলানো থাকতো উঠোনের বনকাটা কাস্তে না কাটারি কী যেন বাবা! খুব ধারালো। হাত বাড়িয়ে কোনোমতে সেইখানা টেনে খুলে নিয়ে নাকি সেই পেল্লাই চুলের গোছাকে মাথার গোড়া থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেটে, খুঁটি থেকে মাথা ছাড়িয়ে নিয়ে পিটটান দিয়েছে।.... দেখে সব্বাই 'ছি ছি' করলো। বললো, সেই বুড়ি তো তবে ঠিকই বলেছিল। অনেক বেশি লম্বা চুল থাকলে 'কুলে কালি' না কী যেন হয়।

....কুলের সঙ্গে চুলের যে—হি হি হি, কী যে সম্পক্কো তা' ভাবলো না।...তো তারপরই নাকি 'ছি ছি'র বদলে 'হায় হায়'। বেলার সময় না কী লোকে দেখে দীঘির জলে লাশ ভেসে উঠেছে। ফুলে ঢোল। মাথার চুল পুঁচিয়ে কাটা।....চেনাই যাচ্ছে না। এ বৃত্তান্ত কতবার বলেছে বুড়ি।....তো এখন চলুন চলুন। সেই কখন থেকে আপনার শ্বশুর আপনার খোঁজ করতে এসে দাদুর কাছে বসে আছে। হি হি হি, আড্ডাই দিচ্ছে, তবে মাঝে মাঝে বলে উঠছে, ও খুকী, এইবার বৌমাকে ডেকে দাও। বেলা হয়ে যাচ্ছে।

....

গ্রামগঞ্জের লোকে যে অবিরত জীবন-মরণের রিস্ক নিয়েও প্রতিকারের চেষ্টাটি মাত্র না করে জীবন কাটিয়ে চলে, নবীনগঞ্জের 'শেয়ালডোবা খালের' এই বাঁশের সাঁকোটি, তার একটি দৃষ্টান্ত। ক'খানা মাত্র বাঁশ ফেলে বানানো এই সাঁকোটার বাঁশ ক'খানায় শ্যাওলা ধরে ধরে পচে এসেছে, মাঝে একখানা একটু মচকেও গেছে। তবু দিনের পর দিন সেইখান দিয়েই শত শত লোক পারাপার করে চলেছে। টলমল করতে করতে, মচকানো জায়গাটাকে সাবধানে ডিঙিয়ে। শিশু বৃদ্ধ নারী সবাই।

অবশ্য ওই 'শেয়ালডোবা' খালটার আয়তন খুবই সামান্য, তবু সেই 'সামান্য'টুকুই গ্রামবাসীর সমবেত চেষ্টায় একটু মজবুত হয়ে উঠতে পায় না।....চলে তো যাচ্ছে, তবে আর কার কী দায়? অথচ ওইটি পার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অসামান্য। কারণ—খালের ওপারেই মস্ত মাঠে 'ধর্মেশ্বরের' মন্দির। যে মন্দিরের চুড়োয় বসানো ঝকঝকে পেতলের ত্রিশূলটি শুধু নবীনগঞ্জ কেন, আরো দূর অবধিও দেখা যায়। আর আশ্চর্য, কেউ কোনোদিন চুড়োয় উঠে মাজা ঘষা তো করতে যায় না, তবু ওই মস্ত ত্রিশূলখানা ঝকঝক করে। রোদ পড়লে চোখ ঠিকরোয়।

ওই মাঠেই শ্রাবণের প্রথম সোমবারে 'ধর্মেশ্বরের' মেলা বসে। তখন ভিড়ের বিরাম থাকে না। মানুষের চাপে সাঁকো ভেঙে পড়ার জো হয়। তবু কী আশ্চর্য ভেঙে পড়ে না। হয়তো কেউ আড়ে দুখানা বাখারি ফেলে, নেহাৎ কমজোরি জায়গাটা একটু শক্ত করে নেয়।

তা মেলার সময় ছাড়াও তো লোকের যাতায়াতের বিরাম নেই। সাঁকোর এপারেই তো শনি আর মঙ্গলের হাট-এর চালা। শনির হাটটা

খুবই জমজমাট, মঙ্গলেরটাও কম নয়। তো যত হেটুরে, ক্রেতা এবং বিক্রেতা প্রায় সব্বাই তো একবার করে 'ধর্মেশ্বর' শিবের মন্দিরে মাথা ঠুকে আসে। এখান থেকে ওখান চোখে দেখা যাচ্ছে হাত বিশবাইশ বৈ পথ নয়, এটুকু পার হয়ে একবার একটু পুণ্যি সঞ্চয় করে আসবে না?

কিন্তু পরমেশ্বরের নামের ছেলেটা তো পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে আসেনি। এসেছিল বৌয়ের একান্ত ইচ্ছাপূরণের সম্মান রাখতে।

সর্বোত্তমা বলেছিল, ওই ত্রিশূলওলা মন্দিরটায় একবার যেতেই হবে আমায়। ত্রিশূলটা যেন আমায় টানে।

পরমেশ্বর বলেছিল, এখানে এসে পর্যন্ত হঠাৎ আবিষ্কার করছি, অনেক কিছুই তোমায় টানে, বাদে আমি।

হেসেছিল, তবু সন্ধান নিতে এসেছিল কোনখান দিয়ে যেতে হয় মন্দিরে। চেনা লোক মোহন ভট্চায্কেই শুধু জিগ্যেস করেনি। ইচ্ছে করেই করেনি। বললেই হয়তো হাঁ হাঁ করে উঠে বলবেন, 'মা লক্ষ্মীর মন্দিরে যাবার ইচ্ছে হয়েছে? আমি নিয়ে যাবো সবাইকেই সঙ্গে করে।' আর সারাক্ষণ মাছির মতো গায়ে লেপটে থাকবেন।

ওইটিই পছন্দ নয় পরমেশ্বরের।

অথচ আশ্চর্য! ওই ঘিনঘিনে লোকটার ওই মেয়ে সত্যি নিজের, না কোনো পালিতা কন্যা-টন্যা? কে জানে।

তো সে যাক, এমনি পথচলতি অচেনা লোকদেরই জিগ্যেস করে করে চলে এসেছে পরমেশ্বর। সকলেই অতীব অবহেলায় বলেছে, 'ওই তো হাটতলার অপজিটে।...আজ মঙ্গলের হাট....বহুলোক চলেছে ওই পথে চিনতে অসুবিধে হবে না।'....

তা রাস্তা চিনতে সত্যিই তেমন অসুবিধে হয়নি। হবার কথাও নয়। ছোট জায়গা। তাছাড়া হাটগামী লোকই তো পথনির্দেশক।

কিন্তু কাছে এসে দাঁড়ানোর পর যখন লোকে বলে উঠলো—ওই তো সাঁকোর ওপারে। সামনেই। তখনই চক্ষুস্থির তার।

এই সাঁকোর ওপর দিয়ে যেতে হবে?

দেখে তো মনে হচ্ছে পা ফেলতে যা দেরি। সঙ্গে সঙ্গেই সোজা নিচেয় 'শেয়ালডোবা'য় নেমে যাওয়া। অথচ সামনে দিয়েই অনেক লোক ওই সাঁকোয় ভর করেই যাচ্ছে আসছে। তা গেলে এলে আর কী হবে? নিজে পা রাখতে গেলেই যে পা উঠিয়ে নিতে হচ্ছে। এইসব লোক

বারোমাস এইভাবে কাটায় ?

একটু অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকায়। খবর অবশ্য নেওয়া হয়েছে কোথায় মন্দির। কিন্তু সর্বোত্তমার আসার ইচ্ছেটা পূরণ হবে কী করে ? ও হয়তো বলে বসবে 'এত লোক পার হচ্ছে'।

তাকিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ চমকে যায়। সুবর্ণা আসছে না ? ওই সাঁকোর মাথার কাছে ঘাড় ফিরিয়ে একটা চাষীবাসী মতো লোককে কী যেন বললো, তারপর এগিয়ে এলো। দিব্যিই এলো। যদিও কিঞ্চিৎ টলমলিয়েই। তা হোক চলে তো এলো দু'মিনিটের মধ্যেই। এবং এসেই গালে হাত দিয়ে বলে উঠলো, ওমা। যা ভেবেছি তাই।

যা ভেবেছেন ? কী ভেবেছেন ?

ওই ওপার থেকেই মনে হলো আপনি। আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো সাঁকোয় পা ঠেকাবার সাহস সঞ্চয় করতে পারছেন না।

পরমেশ্বরের কী মনে হলো না, তার এতক্ষণের অভিযানের সবটাই সার্থক। ভিতরে একটা খুশীর জোয়ার বইল না ? তবু গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললো, স্বীকার করছি সেই অক্ষমতা।···আর ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, এইভাবে আপনারা চালিয়ে চলেন ?

চলবো না ? আমরা কাদের বংশধর ভুলে গেলেন ? ··'মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি।'

হুঁ। তবু বলি, এইটুকু একটু সরানো কী খুবই শক্ত ?

ইচ্ছে থাকলে, কিছুই না।

তাহলে ?

ইস। আপনি এমন ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করছেন। যেন জানেন না এসব কেন হয়।····পাবলিকের জন্যে কার মাথাব্যথা ? যদি কারো মাথাব্যথা হয়, তাহলেই তো সন্দেহ আসবে, লোকটার নিশ্চয়ই নিজস্ব কিছু স্বার্থ আছে। তখন স্বয়ং 'পাবলিকই' সেই মাথাব্যথাওয়ালাদের শুভ চেষ্টাটি পণ্ড করবার তালে উঠে পড়ে লাগবে।····তো এসব তো আর আপনার অজানা নয়। 'পল্লীসমাজ' সর্বত্রই আছে। আপনাদের খাস কলকাতা শহরেও হয়তো আছে। সে যাক, সাঁকো পার হতে তো ভয় খাচ্ছিলেন, এসেছিলেন কী মন্দিরের উদ্দেশ্যে ?

তাই। এই হতভাগ্যের ওপর আদেশ হয়েছে, ওই 'ত্রিশূলে'র মূল উৎস আবিষ্কার করতে হবে।

ত্রিশূলের। শিবঠাকুর নয়, টেরাকোটা কাজের মন্দিরটা নয়, ত্রিশূল? কেন বলুন তো?

কী জানি। হয়তো জিনিসটাকে দিয়ে সহজে কিছু 'বিদ্ধ' করা যায় বলে। কিন্তু আপনি? আসেন বুঝি রোজ শিবঠাকুরকে পুজো করতে?

সুবর্ণার মুখে বিদ্যুৎ খেলে যায়। মুখ টিপে হেসে বলে, ধরুন তাই।

সেটাই তো ধরেছি। শুনেছি ভালো বর পাবার আশায় মেয়েরা শিবঠাকুরের পুজো করে।

মেয়েদের সম্পর্কে আর কী কী শুনেছেন?

লিস্টটা মুখস্থ নেই।

তাহলে ওটা অজানাই রইল। যাক যাবেন 'ধর্মেশ্বরের' মন্দিরে?

ওই সাঁকো দিয়ে?

ধরুন কেউ যদি হাত ধরে পার করে দেয়? খুব সাবধানে।

পরমেশ্বর ফস করে বলে ওঠে, তাহলে একশোবার যেতে রাজী আছি।

আচ্ছা দাঁড়ান।

সুবর্ণা হঠাৎ পরমেশ্বরের পিছন দিকে তাকিয়ে কাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা হাফপ্যাণ্ট আর গেঞ্জি পরা ছেলে দৌড়ে এসে দাঁড়ায়। সুবর্ণা অত্যন্ত অমায়িক গলায় বলে, এই যে এই ছেলেটা। এর পেশাই হচ্ছে ছোট ছেলেমেয়েদের কিংবা কমসাহসী লোকদের ধরে পার করাকরি। সামান্যই পারিশ্রমিক।

এর মানে। ভেবেছে কী ও? রাগে অপমানে মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে পরমেশ্বরের। ওর মনে হয়, মেয়েটা যেন তার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছে।

আপনার উপকারের চেষ্টার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।

বলে উল্টোমুখো হয়ে জোর পায়ে এগিয়ে যেতে থাকে পরমেশ্বর।

সঙ্গে সঙ্গে বাচাল মেয়েটাও চলে আসে।....জোরে জোরে হেঁটে ধরে ফেলে পিঠে একটা হাত ঠেকিয়ে বলে ওঠে, কী হলো? এত রেগে গেলেন কেন?

পিঠে হাতের স্পর্শ।

ঈষৎ নরম হতেই হয়। গম্ভীরভাবে বলে, রাগের কী আছে? যেতে

ইচ্ছে হলো না, গেলাম না।

কী মুশকিল! ব্রাহ্মণসন্তান, ঠাকুর দেখতে এসে না দেখে ফিরে যাবেন? চলুন। চলুন।

বলেই খপ করে ওর একটা হাত ধরে বলে, চলুন—বিনা পারিশ্রমিকেই পেঁৗছে যেতে পারবেন।

হাতধরা। সমস্ত শরীর অবশ, রোমাঞ্চিত। তবু পরমেশ্বর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, পারিশ্রমিক দেবার ভয়েই চলে যাচ্ছিলাম তাহলে?

ইস্। আপনি এত রাগী কেন বলুন তো?

সবাই আপনার মত হবে, এমন কোনো কথা নেই।

তা সত্যি। আমি কিন্তু একদম রাগি না। আমার একমাত্র 'হবি' অন্যকে রাগানো। কাউকে রাগাতে পারলে দারুণ মজা লাগে আমার।

হবিটা অবশ্য 'অন্যের' পক্ষে খুব সুবিধের নয়।

এই দেখুন। অন্যের সুবিধে আবার কে চায়? সে যাক যাবেন তো চলুন।

আজ আর থাক।

মেজাজ খচে গেছে?

যা খুশি বলতে পারেন।

হাটে ঢুকবেন?

সর্বনাশ! কেন?

এমনি। আমার তো হাট ঘুরতে বেশ মজা লাগে।

আপনার 'মজা' লাগার ক্ষমতাটি প্রশংসনীয়। আচ্ছা আপনি আপনার বাড়ির সকলের থেকে একেবারে আলাদা হলেন কী করে?

সে প্রশ্ন তো আমার নিজের কাছে নিজেরই। চেহারাটা অবশ্য শুনেছি আমার পরলোকগত পিতামহীর সূত্রে পাওয়া। তবে তিনি আমার মতো এমন দজ্জাল জাঁহাবাজ আর দুর্মুখ ছিলেন বলে শুনিনি। খুবই নাকি নম্র প্রকৃতির মহিলা ছিলেন।

নিজের সম্পর্কে বিশেষণগুলো ভালোই আবিষ্কার করেছেন দেখছি।

নিজের আবিষ্কার? এ তো সমগ্র নবীনগঞ্জবাসীর অবদান। তবে এতেও আমার বেশ মজা লাগে।

সাধে বলছি আপনার 'মজা লাগার' ক্ষমতাটি অতুলনীয়। কিন্তু

আমরা এখন কোনদিকে যাচ্ছি ?

ভয় নেই, ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছি না। বাড়ির দিকেই। তবে পাড়ায় ঢোকার সময়, আলাদা হয়ে পড়তে হবে একসঙ্গে বেড়িয়ে ফিরছি, এমন দৃশ্য রচনা না করাই ভালো।

পরমেশ্বর চকিত হয়ে বলে ওঠে, আপনিও এসব কেয়ার করেন ?

নিজের জন্যে করি না, আপনার জন্যে করা উচিত বলে মনে করছি।

আমার জন্যে ? আপনি আমায় কী ভাবেন বলুন তো ?

রীতিমতো উত্তেজিত দেখায় পরমেশ্বরকে।

সুবর্ণা হেসে উঠে বলে, আপনাকে যে কত সহজে ক্ষ্যাপানো যায়। নাঃ। আমি আপনার সম্পর্কে কিছুই ভাবি না, তবে আর কেউ ভাবে, সেটা চাই না। আপনি যে 'কলকাতায় ফিরবো' বলেও আরো দু'দিন রয়ে গেলেন, এর জন্যে আপনার বাবাকে কিঞ্চিৎ ভাবিত বলে মনে হলো।

বাবা !

হুঁ। বাবাই। আপনার গিন্নী তো আপনাকে হিসেবের খাতায় ধরেন বলে মনে হয় না।

এবার সত্যিই ভারী চটে ওঠে পরমেশ্বর।

লাল হয়ে ওঠা মুখে বলে, আপনি শুধু লোককে রাগিয়ে দিয়েই মজা পান না, অন্যকে অপমান করেও আহ্লাদ পান মনে হচ্ছে।

সুবর্ণা কিন্তু দমে না। বেশ সহজ গলাতেই বলে, কী করবো বলুন আমার যা চোখে পড়ে, আমি তা বলে ফেলি, এই আমার একটা মহা দোষ। আপনার মিসেস তো ঠিক করে ফেলেছেন, আপনাদের ওই পোড়ো বাড়িটাকে হস্তান্তর না করে সারিয়ে নিয়ে নিজস্ব একটা আস্তানা বানিয়ে নিতে। যাতে যখন ইচ্ছে এখানে এসে থাকতে পারেন।

পরমেশ্বর অবহেলার গলায় বলে, ছাড়ুন তো। ওসব সাময়িক শখের খেয়াল। কলকাতা ফিরে গেলেই আর মনেও থাকবে না।

সুবর্ণা হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, সেটা হলেই ভালো, তবে আমার মনে হয় বাড়িটা আপনাদের না রাখাই মঙ্গল।

পরমেশ্বরের মনের মধ্যে ফট করে একটা প্রতিশোধের ভাব জেগে ওঠে। তীব্র আকর্ষণও তো অনেক সময় প্রতিহিংসার জন্ম দেয়। কিছু

পুরোনো অপমানের জ্বালাটার দাহ রয়েছে ভিতরে। তাই ফট করে বলে ওঠে 'মঙ্গলটা' বোধহয় আপনার বাবারই বেশি।

সুবর্ণার ঠোঁটের কোণে একটু সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে। সেই হাসি লাগানো স্বরেই বলে, ওটুকুতে আমার কিছু এসে যাবে না। গণ্ডারের চামড়া। তাই আবারও বলছি, মোহন ভটচায্যির মঙ্গলের চিন্তা করতে অন্য কারুর দরকার হয় না। তিনি নিজেই সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তাশীল! মঙ্গলটা আপনাদেরই। বাড়িটা ভালো না।

এই রূপসী মেয়েটার চোখেমুখে সর্বদাই যেন একটু তীক্ষ্ম বিদ্রূপের রেখা। কেন? তাকে যে ওই নির্ঘিন্নে মোহন ভটচায্যির পরিচয়ের দায় বহন করে চলতে হয়, এটা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? অর্থাৎ ব্যঙ্গটা নিজেকেই?

পরমেশ্বরকে এখন প্রতিশোধের নেশা পেয়ে বসেছে। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, জানি। কে যেন কোথায় গুমরে গুমরে কাঁদে, মাঝরাত্তিরে ছাতে উঠে খোলা চুল ছড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়, আরো কী কী সব যেন করে।

সুবর্ণা আরো গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, কেউ সেসব করে কিনা জানি না তবে আপনার মিসেসের ওপর একটা খারাপ প্রভাব পড়েছে, সেটা লক্ষ্য করবেন। হতে পারে ওটা এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা। তবে ক্ষতিকর তো? ওঁকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন।

পরমেশ্বর ক্ষুব্ধভাবে বলে আমি চেষ্টা করবার কে? নিজেই তো বললেন, আমি তাঁর হিসেবের বাইরে।

হিসেবের মধ্যে আনবার চেষ্টা করুন। আলেয়ার আলো দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। আচ্ছা নমস্কার। এখান থেকেই কাটছি। ওই বট গাছটার পাশ দিয়ে গেলেই আপনার বাড়ির শর্টকাট।

পরমেশ্বর একটু দাঁড়িয়ে পড়ে বলে ওঠে, আপনার ব্যবহারে জন্মান্তরবাদ মানতে বাধ্য হচ্ছি।

সুবর্ণা হেসে ওঠে, কেন? মনে হচ্ছে বুঝি পূর্বজন্মে আমি আপনার শত্রু ছিলাম। তাই দেখা হয়েই পুরনো ঝগড়া চালিয়ে যাচ্ছি। তা ছিলাম হয়তো। আমি তো পূর্বজন্ম পরজন্ম, ভূত ভগবান সবই মানি। যে জিনিসটা আমার বুদ্ধির এলাকার বাইরে, অথচ যুগ যুগ

ধরে কোটি কোটি লোক মেনে আসছে, তাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে যাবো, এমন আহাম্মক নই।—আচ্ছা! টা টা!

একটু নাবাল মতো জায়গায় নেমে পড়ে পাশের দিকে এগিয়ে যায়।

বাবা!

বড় ঘোষাল বাড়ি থেকে বেরিয়েই সর্বোত্তমা শ্বশুরের কাছাকাছি এসে চাপা গলায় উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠে, বাবা! সন্ধান পেয়ে গেছি।

সন্ধান পেয়ে গেছো?

লালু অবাক ভাবে বলেন, কিসের?

চাবির! ওই সিন্দুকটার চাবির। বাবা! দেখুন আহ্লাদে আমার হাত পা কাঁপছে!

লালকমল বিমূঢ়ভাবে বলেন, কোথায় পেলে মা?

রাস্তায় তো বলা চলবে না! বাড়িতে চলুন বলছি। বাবা। বৃথা চাবি চাবি করে এত ভাবনা তো হচ্ছিল। আসলে চাবিই নেই। স্রেফ কৌশল। দেখবেন চলুন।

বৌমার মুখে তীব্র উত্তেজনার একটা রক্তোচ্ছ্বাস।

বিচলিত হন লালু। কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকে।

পরমটাও তেমনি। কলকাতায় যদি ফিরলিই না তো বৌয়ের কাছাকাছি থাক। নির্ঘাৎ মোহনের সেই মেয়েটার সঙ্গে কোথাও ভিড়ে গিয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। মেয়েটা এদিকে ভালোই, তবে বড় বেশি বেপরোয়া। কিন্তু আমার ছেলেটা যে এত হালকা স্বভাবের তা জানতাম না। এবার ফিরে যাওয়াই ভালো। বৌমার খেয়ালের প্রশ্রয় দেওয়া বোধহয় ঠিক নয়। এখানে এসে এই কটা দিনের মধ্যেই ওদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে যেন কেমন একটা নড়বড়ে ভাব এসে গেছে মনে হচ্ছে। এটা দুর্লক্ষণ! এতোটা বাড়তে দেওয়া কাজের কথা নয়।···আচ্ছা সে যাই যেমন হোক আমি কী কখনো 'পরমের মা' ছাড়া আর কারো দিকে তাকিয়েছি কখনো? আমাদের তো সেই নাপিতে পুরুতে বিয়ে অথচ এদের কতো ইয়ে—

বাবা! আসুন। এ ঘরে চলে আসুন।

লালুকে প্রায় টেনেই নিয়ে যায় সর্বোত্তমা। সেই সিন্দুকের ঘরে।

এখন বেলা প্রায় দুপুর। জানলা দিয়ে রোদ এসে ঘর আলোয়

ফাটছে। আর রমার মার আপ্রাণ চেষ্টায় সিন্দুকেঠার ধুলিধুসর বিবর্ণ ভাবটা অনেকটাই কেটে গেছে। এমনকী পেতলের সেই গুলিগুলোকেও রমার মা উঠোন থেকে ছিঁড়ে আনা আমরুল পাতা ঘষে ঘষে একটু চকচকে করে তুলেছে।

তার বক্তব্য, 'দিনমানে রোদ আলোর সময় ঘরটায় ঢুকলে কিছু না। কিন্তু বেলা পড়ে এলে সন্ধ্যার ছায়া নামলেই ঘরটার মধ্যে ঢুকলে কেমন গা ছমছম করে।'

তাই দিনমানে এসে ঝাঁটা ন্যাতা ঝাড়ন ইত্যাদি নিয়ে সে ঘরটার সংস্কার সাধন করে যায়। চাবিবন্ধ সিন্দুকটা সম্পর্কে তো রমার মারও অসীম কৌতূহল। এতবড় একখানা বাহারি নক্সাকাটা সিন্দুক এতকাল যাবৎ একখানা পোড়ো বাড়িতে পড়ে আছে। অথচ এদেরই সম্পত্তি। তো কৌতূহল হবে না, ভেতরে কী আছে দেখতে! কে জানে, টাকা-কড়ি, গহনা-গাঁটি, না সেকালের জমিদারবাবুদের বাড়ির মতো শুধুই রাশিরাশি কাগজপত্র?

ছেলেবেলায় রমার মা তার বাবার সঙ্গে তাদের গ্রামের 'বাবুদের বাড়ি' যেতো মাঝে মাঝে। দেখতো মস্ত একটা সিন্দুক থেকে বাবুর একটা কর্মচারী শুধু গোছা গোছা কাগজপত্রই বার করতো। লালখেরোয় বাঁধানো মোটামোটা সব খাতা। তেমনিই কিছু আছে হয়তো। টাকাকড়ি সোনাদানা আবার এতকাল একলা পড়ে থাকলে, থাকে নাকি? মানুষে নিতে না পারলে ভূতেও উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

তবু কৌতূহল।

লালু বললেন, ও বৌমা! এই 'সন্ধান' তো তোমার সেই পাগলা বুড়ির কাছে?

বাবা! 'পাগলা' বলে উড়িয়ে দেবেন না। ওঁর কথার মধ্যে অনেক এলোমেলো ভাব আছে বটে, কিন্তু ভেজাল নেই। আর অকারণ বানানো কিছু হবেই বা কেন? আমি বলছি ওটাই ঠিক। চাবি নয় স্ক্রুর ব্যাপার। ওই পেতলের গুলিগুলোকে ঘোরালেই—আসলে ওগুলোই 'স্ক্রু'র মাথা। আমার যেন মনে হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি কে একজন লোক পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে ওগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলে খুলে তুলে পাশে রাখছে।

বৌমা ! তুমি যে এমন কল্পনাপ্রবণ মেয়ে, তা তো এতদিন জানতাম না। দেখে আশ্চর্য হচ্ছি. আমাদের ছেলেবেলায় মামার বাড়ির ঠিক পাশের একটা বাড়িতে একটা ছোট মেয়ে থাকতো। আমার থেকে ছোট, নীলুর বয়সী বছর পাঁচ ছয়ের হবে, সে সর্বদা কী বলতো জানো ? তার নাকি কোনো একটা বাড়িতে অনেক ছেলেমেয়ে আছে, ছেলের বৌও আছে। বৌটা খুব দুষ্টু, তাই সে পালিয়ে এসেছে। তার সেই ফেলে আসা সংসারকে সে নাকি যখন তখন দেখতে পায়। তাই তাদের সঙ্গে কথা বলে। সেই নিয়ে সবাই কী হাসাহাসি করতো। বলতো, তোর মেজ ছেলেটার খবর কী ? তোর মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে ? তারও চটপট জবাব। সত্যি মানুষের সংসারের মতো। পরে বড় হয়ে যাওয়ার পর সেকথা তুললে মানতো না। বলতো 'য্যা ! ধ্যাৎ' ! আসলে ওটা হচ্ছে ছেলে-মানুষের কল্পনা-প্রবণতা ! গিন্নীদের মতো হবার বাসনা !

ঠিক আছে। আপনি ঘোরান তো। যদি দেখেন হলো না তখন না হয় বলবেন, 'কল্পনা-প্রবণতা।'

কিন্তু ঘোরানো কী লালুর সাধ্যি ? কত কালের জং ধরা জিনিস। তবে তার গঠনভঙ্গী দেখে অবিশ্বাসও আসছে না। দু'একটা যেন একটু নড়লোও। বললেন, মিস্ত্রী লাগবে। স্ক্রু ড্রাইভার চাই। পরমটাও তো ফিরছে না। কোথায় গেছে। তোমায় বলে গেছে কিছু ?

সর্বোত্তমা মাথা নাড়ে।

এখানে এসে ওর এমন টো টো কোম্পানী করে বেড়ানো রোগ হলো কেন ? কাউকেই তো চেনে জানে না। একটা পরামর্শও ছিল।

সর্বোত্তমা হেসে উঠে বলে, পরামর্শ। ভালো লোকের সঙ্গে বটে।

তা যা বলেছ মা ! সবকিছুতেই ওর যেন গা-ভাসা ভাব। নীলুর ছেলেটা তো ওর থেকে অনেক ছোট। তবু অনেক তুখোড়।

এখন ঘর রোদে ভাসছে। এখন কোথাও কোনো ছায়া ছায়া অন্ধকার নেই। সর্বোত্তমা তাই হেসে ফেলে বলে, যেমন আপনার 'নীলু' আপনার থেকে ছোট হলেও অনেক তুখোড়।

হা হা করে হেসে ওঠেন লালু। বলেন, এ মেয়েটা তো দেখছি আচ্ছা। যা বলেছ। পরামর্শ তো ওকে নিয়েই। আমরা তো ভাবছি—ভিটে বাড়িটা না হয় থাক। কিন্তু নীলু কী রাজী হবে ? ঠিকই বলবে,

রেখে কী লাভটা হবে ? কে বাস করতে আসছে ? এতগুলো টাকা যখন হাতে আসছে, তখন মিথ্যে সেণ্টিমেণ্টের কোনো মানে হয় না।

বাবা !

কীগো মা !

কত টাকা পাওয়া যাবে ?

ওই তো একটা দালাল তো ঝুলোঝুলি করছে। এই বাড়ি, বাড়ির লাগোয়া জমি, বাঁশবাগান, পুকুর ফুকুর সব মিলিয়ে হাজার ষাটেক টাকা দিতে প্রস্তুত। সত্যি কম তো নয়।

বাবা। কাকার অর্ধেক আর আপনার অর্ধেক তাই না ?

তাতো নিশ্চয়। একদম ফিফটি ফিফটি। আর আমরা দু'ভাই বেঁচে থাকতে থাকতে হলে জটিলতা কম হবে। সেই কথাই বলছিল ভটচায্যি।

তো উনি তো নাকি আরো অনেক কিছু নিজে নিজেই বেচে দিয়েছেন। তখন তো কাকার কথা ওঠেনি।

লালকমল হাসেন, সেসব তো বেআইনি ব্যাপার মা। আমাদের জানাই ছিল না কোথায় কী আছে। তবে এটা হলো পাঁচজন জানিত জিনিস। সবাই জানে ঘোষালদের ভিটে'। তাই আর নিজে নিজে সাহস হয়নি।

আচ্ছা বাবা ! কাকাকে যদি 'কাকার ভাগের' বলে তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে দেওয়া হয় ? রাজী হবেন না ?

'যদি ভাগের টাকাটা দিয়ে দেওয়া হয়।'

লালকমল হতভম্বের মতো তাঁর ছেলের বৌয়ের আবেগ-আরক্ত মুখটার দিকে তাকান। ব্যাপারটা কী ? মেয়েটার কী হঠাৎ এখানে এসে কিছু হলো ? নাকি এইরকম অ্যাবনর্ম্যাল গোছেরই ছিল ? ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেননি লালকমল তাঁর ছেলের স্বোপার্জিত বৌটির প্রতি ? বোধহয় দেখা হয়নি তেমন করে। দিনের বেশির ভাগটাই তো বাইরে বাইরেই থাকে। বাড়িতে যেটুকু থাকে তার মধ্যেও সিংহভাগটা বরের কাছাকাছিই কাটে। আর অনেকখানি শাশুড়ীর আওতায়। লালু আর কতটুকু দেখেন। তবু বৌটির শ্রদ্ধা সমীহ আর হৃদ্যতা ভাবটি আছে বলেই শ্বশুর-বৌয়ের মধ্যে সম্পর্কটি বেশ ভালো। কিন্তু মাঝে মাঝেই বৌ কেন অ্যাবনর্মালের মতো কথাবার্তা বলে ; এটা তো ভালো লক্ষণ নয়।

তবু লালু মনের ভাব চেপে রেখে বলেন, কিন্তু না বেচলে আর ভাগের টাকাটা আসবে কোথা থেকে বৌমা।

সর্বোত্তমা অবলীলায় বলে, এমনি নিজেদের থেকে।

এমনি ! নিজেদের থেকে ? জানোই তো মা আমি একটা রিটায়ারড-ম্যান। তা ছাড়া সেদিন মায়ের 'কাজে'ও তো বেশ কিছু গেলো—মানে আমিই তো বড়। তাতে আমারই দায়িত্ব ! হাসলেন একটু, সেখানে ফিফটি ফিফটির ব্যাপার নেই।

আচ্ছা বাবা ! বিয়ের সময় বাবা তো আমাকে অনেকগুলো গহনা-টহনা দিয়েছিলেন, সেগুলো দিয়ে হতে পারে না ?

লালু মনে মনে মাথায় হাত দিলেন।

নাঃ। এ মেয়ে নর্ম্যাল নয়।

ভীষণ রাগ হচ্ছে ছেলের ওপর। বেহুঁশ ছেলে. কোথায় না কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস এখনো। বৌ কী ধরনের জানিস না তুই ? আবার হঠাৎ কেমন একটা ভয়ে এই ভরদুপুরেও গাটা কেমন সিরসির করে ওঠে লালকমলের। সত্যিই কী ছিল এইরকম ? না এখানে আসার পর। লালুকেও কী তাহলে গ্রাম্যদের মতো বিশ্বাস করতে হবে মেয়েটাকে 'কিছুতে' ভর করেছে।

তবু সময়ক্ষেপণ করতে বলেন, কী যে বলো মা ! তোমার বাবার দেওয়া বিয়ের যৌতুকের জিনিস—

তাতে কী ? আমি তো পরিই না। সব তো 'ভল্ট' এই পড়ে থাকে। ··আগেও তো আমি শুধুই শাঁখা নাকি যেন পরে থাকতাম ? কী হয় তাতে ?

গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

আগে তুমি শুধু শাঁখা পরে থাকতে ! বৌমা ! কী সব বলছো বল তো ?

সর্বোত্তমা কী উত্তর দিতো কে জানে, ত্রাণকর্তার মতো এসে গেল পরমেশ্বর। মুখ রোদে লাল, গায়ের চিকণের কাজকরা মিহি পাঞ্জাবীটা ঘামে ভিজে শপশপে।

লালু ক্রুদ্ধ গলায় বলে ওঠেন, এত রোদে কোথায় ঘুরছিলি ? কত বেলা হয়েছে খেয়াল আছে ?

পরমেশ্বর পাঞ্জাবীটাকে গা থেকে ছাড়াতে ছাড়াতে অবহেলার ভাবে

বলে, হলে আর কী হবে? যেতে হয়েছিল তোমার আদুরে বৌমার ত্রিশূলের উৎস সন্ধানে।

কী? কী? কিসের সন্ধানে?

ওই যে জানলা দিয়ে যে মন্দিরের চুড়োর ত্রিশূল দেখা যায়, সেখানে যাবার পথ কী? দূরত্ব কী? এসব সন্ধান নিয়ে এলাম। তবে—

এইবার সর্বোত্তমার দিকে তাকিয়ে বলে, যেতে হলে যেতে হবে ভাঙা বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে। 'শিব' দেখার আগেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে যেতে পারে। সেইভাবেই যেতে চাও তো যাওয়া যাবে কাল।

লালু বলে ওঠেন, বলিস কীরে? এখনো বাঁশের সাঁকো? আমার তো মনে পড়ছে খুব ছেলেবেলায় একবার যেন গিয়েছিলাম। ওই ভয়ে ভয়ে পড়ে যাচ্ছি পড়ে যাচ্ছি ভাবে! তার আর উন্নতি হয়নি!

আমাদের এই সোনার দেশে ওসবের উন্নতি সহজে হয় না বাবা! উন্নতি হয় মানুষের সাজসজ্জায়। হয়তো তোমাদের ছেলেবেলার পর আর দু একখানা নতুন বাঁশ পড়ে থাকবে, তো তাদেরও তো বয়েস হয়ে এলো। তোমার বৌমার তো বাই চেপেছে যেতে হবে ওখানে।

কারণ নেই, তবু পরমেশ্বর যেন অনেক কথা দিয়ে কিছু একটা চাপা দিতে চায়। যেন কোথায় রয়েছে একটা ধরা পড়ে যাবার ভয়। তাই দ্রুত এতো কথার জাল বিস্তার।

লালু তাড়াতাড়ি বলেন, না না! যাওয়াটায় যখন রিস্ক বলছিস, দরকার কী? হ্যাঁ বৌমা? কী দরকার, অ্যাঁ?

সর্বোত্তমা আস্তে বলে, তবে থাক। একবার তো যাওয়া হয়েছিল। এখন বরং তাড়াতাড়ি—

পরমেশ্বর কপাল কুঁচকে বলে, একবার যাওয়া হয়েছিল?

বাঃ। যাওয়া হয়নি, কবে যেন সেই একবার? কী ভিড়! কী ভিড়! ভিড়ের চোটে আমার কানের মাকড়ি হারিয়ে গেল। কে যে খুব বকলো। কিন্তু সে তো নৌকোয় চেপে।

লালু ছেলের দিকে একবার তাকাতে চেষ্টা করেন। চেষ্টা সফল হয় না। ছেলে তার বৌয়ের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চেয়ে আছে।

লালু বিহ্বলভাবে বলেন, নৌকোয় চেপে?

হ্যাঁ তো। মনে নেই আপনার? সেই কেমন একরকম মজাদার

নৌকো। নৌকোর ওপর একগাদা লোক উঠলো, আর মাঝিটা সেই কেমন একরকম কায়দায় 'হে'ই' করে নৌকোর এমুখটা ওপারের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে পাড়ের কাছে পেঁাছে দিল? মনে পড়ছে না? ও! আপনি বোধহয় যাননি সেদিন। ভিড়ে গিজগিজ তো! কারা যে সব ছিল ভুলে যাচ্ছি।...মন্দিরের মধ্যেটা কী অন্ধকার মতো! আর ভেতরে যত রাজ্যের বেলপাতা জমানো। কীরকম বুনোবুনো গন্ধ আর শ্যাওলা। বাবাঃ। পড়ে যাই আর কী।

লালু দেখছেন ছেলে তার বৌয়ের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে, যেন কী একটা ওয়াচ করছে। এখন বলে উঠলো, তাহলে আর আবার যাবার দরকার কী?

থাকগে যাব না। এখন তাড়াতাড়ি একটা মিস্ত্রী ডেকে আনো তো। যে মিস্ত্রীদের কাছে স্ক্রু ড্রাইভার থাকে।

এতক্ষণে পরমেশ্বর বাপের মুখের দিকে তাকায়।

বাবা কেমন হতাশ দৃষ্টি মেলে তাকান। তারপরই তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, হ্যাঁ একটা ছুতোর মিস্ত্রীর দরকার পড়ছে। আসলে ওই সিন্দুকটার—

পরমেশ্বর রাগের গলায় বলে ওঠে 'মিস্ত্রী' বললেই মিস্ত্রী পাওয়া যাবে? এখানে কোথায় কী তা আমি জানি? এখন পেটের মধ্যে মোটর বাইক চলছে। কী কোথায় আছে বার করো। চিরকালের বন্ধ সিন্দুক আর দু'ঘণ্টা বন্ধ থাকলে কিছু এসে যাবে না।

এতক্ষণে রমার মা মঞ্চে এসে হাজির হয়। বলে রাঁধা ভাত শুকিয়ে 'চাল' হয়ে গেল। কারুর দেখা নেই। আজ ওই 'অন্য ঘোষাল বাড়ি' থেকে টাটকা বাটামাছ পাঠিয়েছিল বৌমার নাম করে। তেলঝাল দিয়ে রাঁধা হয়েছে। কেরোসিনের ঘাটতি ছিল। ভাঙা চাতালের একধারে কাঠকুটো জেবলে কাজ সেরেছে। অথচ যারা খাবে তারা হাওয়া! তো কবে কলকাতায় ফেরা হবে সেটা বলো।

রমার মার মধ্যে আর প্রথমদিকের সেই অসাধারণ করে তোলার উৎসাহটি দেখা যাচ্ছে না তেমন।

খাবার তাড়া দিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বলে, বৌদিদির ধরন বোঝা ভার। কখনো সহজ, কখনো যেন কেমন কেমন। এ বাড়ির হাওয়া বাতাস ভালো না। কলকাতায় ফি:র চলুন মেসোমশাই।

তা বৌদিদির ধরন বোঝা ভারই বটে। সহজ তো দারুন 'সহজ'।

খেতে বসতে এসে সেই সহজতা এসে যায়। ও রমার মা, এ কী কাণ্ড করেছ বাবা ? ওরা না হয় মাছটাই পাঠিয়ে দিয়েছে, আর এইসব ? লাউ তরকারি, উচ্ছে ভাজা, ডাঁটা চচ্চড়ি, আমের চাটনি। মার্ভেলাস। ....লেবু কোথায় পেলে গো ? এখান সেখান থেকে আহরণ করে ? বাবা। বাবা! দেখছেন ? রমার মার এই সবই নাকি আহরণ করা। বাদে আলুটা। আলু নাকি মুদির দোকানেই পাওয়া যায়। রমার মা এখানের সব কিছু চিনে বসে আছে। রোজ রোজ কলাপাতাই বা পাও কোথায় গো ?

...আচ্ছা রমার মা, চা চিনি আমুল বিস্কুট এ সব এতদিন চালাচ্ছো কী করে ? অনেক আনা হয়েছিল ?

মোটে তো পাঁচদিন কেটেছে ? মোটে পাঁচদিন! বল কী রমার মা ? আমার যেন মনে হচ্ছে কত কত দিন আছি এখানে। আচ্ছা বাবা, কলকাতার বাড়িতে যে কাকে দিয়ে যেন খবর দেবেন বলেছিলেন, দেওয়া হয়েছে ? হয়নি ? মা তো ভাবনা করছেন। . ওঃ। মাকে বলেই এসেছিলেন আপনার সপ্তাহ খানেক হতেও পারে। তবু—ও। তাইতো বটে। আপনার পুত্তুরটির তো একদিন পরেই ফেরার কথা ছিল।.... হঠাৎ এখানে যে কী 'টান' এসে গেল। ..

এই কলকল্লোলময়ীই হঠাৎ আবার এক সময় বলে বসে, বাবা। আপনারা চলে গেলে আমায় না হয় ওই বড় ঘোষাল বাড়িতে রেখে যাবেন। ওঁরা তো আত্মীয়ই। লোকও ভালোই।

আমরা চলে যাবো, তোমায় রেখে যাবো ?

তো আমায় তো থাকতেই হবে বাবা। সিন্দুকটা না দেখা পর্যন্ত— কী অদ্ভুত দেশ বাবা! যদি বা মিস্ত্রী জুটলো তো তার কাছে যন্ত্রপাতি নেই। শুধু হাতুড়ি বাটালি আর করাত দিয়ে সব কাজ হয় ?

পরমেশ্বর আড়ালে বলে, দেখো বাবা। ধমকই হচ্ছে এর আসল দাওয়াই। এ হচ্ছে একরকমের হিস্ট্রিরিয়া। যেটা ডাক্তারী শাস্ত্রমতে অনেকটা 'ইচ্ছাকৃত'। নিজেকে অন্যরকম ভাবতে ইচ্ছা করা। এবং অন্য লোককেও সেটাই ভাবানোর চেষ্টা।

অত কথা জানি না বাবা। ধমকটমক দিতে যাসনি। ভালো কথায় বুঝিয়ে বল।

ভালো কথা ? যিনি স্হির করে ফেলেছেন গহনা বেচেও এই ভাঙা ইঁটের বোঝা আগলাবেন, তাঁকে বোঝাবার মতো 'ভালো' কথা আমার স্টকে নেই। আমি কাল চলে যাচ্ছি, তোমার যা ইচ্ছে করো।

বৌমাকে ফেলে রেখে চলে যাবি ?

তা কী করবো ?

পরমেশ্বর জোরে জোরে বলে, চাকরিটা খোওয়াবো ?··· একবার একটা টেলিগ্রাম করা হয়েছে 'কোনো কারণে আটকে পড়েছি—শনিবারে পেঁছচ্ছি—' আবার একটা করতে বল ? কী বলে করবো ?

কী মুশকিল। আমি কী তাই বলছি ? শুধু বলছি বৌমাকে ধমক-টমক দিসনি।

····ঠিক আছে। ভালো কথাই কয়ে দেখি।

কিন্তু 'ভালো কথা'র উত্তরটা ভালো আসে কই ?

তোমার কী হয়েছে বল তো ? যখন তখন যা ইচ্ছে উল্টোপাল্টা কথা বলো কেন ? যেন ঘাড়ে ভূত চেপেছে।

তার উত্তর আসে। ব্যাকুলভাবে। 'তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ গো ! ঘাড়ে কেউ চেপেছেই বোধহয়। মনে হয় 'আমি' আর 'আমি' নেই। আমি হারিয়ে গেছি। কোথায় চলে গেছি। অন্য একটা সংসার দেখছি। ····অথচ এই বাড়িটাই।····হয়তো আমারই প্রেতাত্মা আমায় ভর করেছে।'

তোমার প্রেতাত্মা তোমায় ভর করেছে। চমৎকার। হঠাৎ হঠাৎ মনে হচ্ছে কী জানো ? এটা বোধহয় আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে একটা মজার খেলা বানিয়েছো। আর না হয়তো সত্যি পাগল হয়ে গেছো।

সর্বোত্তমা মলিনভাবে বলে, শুধু শুধু ভয় দেখাতে যাবো কেন ? তাহলে হয়তো সত্যিই পাগল হয়ে গেছি।

চমৎকার !

ওমা ! তুমিও যে ভটচাযমশাইয়ের মেয়ের মতন বললে 'চমৎকার' !

ভটচাযমশাইয়ের মেয়ে ! সে আবার কবে এলো ?

ওমা ! এইতো দুপুরেই এসেছিল। তুমি তখন মিস্ত্রী খুঁজতে গেছো। আমি বললাম, মাঝে মাঝে কেমন গুলিয়ে যায়, ভেবে পাই না 'আমি কে ?' ও বললো—'চমৎকার !'

হুঁ। আর কী বললো ?

কত কী বললো, সব কি মনে আছে ? ভাঙা সাঁকো নিয়ে কী সব বলছিল, আর খুব হাসছিল।

বটে ? 'কী সব'টা কী ?

বললাম তো, সব কি মনে থাকে ?....তো বললো এ বাড়ি থেকে চলে যেতে। বাড়িটায় ভূত আছে। হি হি হি। সেই ভূতটা যে আমিই তা জানে না। তবে ও কিন্তু এ বাড়ির অন্য অনেক কথা জানে। বলে 'শুনে শুনে মুখস্থ।'....জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেই যে ছোটো ছেলেটা ? যে কেঁদে কেঁদে বলেছিল, 'বাবা ! মার চুল ছেড়ে দাও ! মার লাগছে –' সেই ছেলেটা কোথায় গেল ? তারপর কী মরে গেল ?...তো ভটচার্যির মেয়েটা গালে হাত দিয়ে বলে কি না, 'ওমা ! সে কী ? মরবে কেন ? সেই ছেলেটাই তো পরে বড় হয়ে স্বর্ণচাঁপাদেবীর বর হলো, লালকমল নীলকমলের বাবা হলো।....পরে অবিশ্যি বৌ ছেলে রেখে খুব তাড়াতাড়ি মরেই গেছলো।'....আচ্ছা তোমার অদ্ভুত কথাটা বিশ্বাস হয় ? লালকমল তো তোমার বাবা। আর সেই কোন একটা ছোট ছেলে ভাবতে গেলে কেমন মাথা গুলিয়ে যায়। লিঙ্ক্ খুঁজে পাই না।

এই মেয়েকে পরমেশ্বর কোন ভালো কথা বলে বোঝাতে বসবে ? কী কুক্ষণেই এখানে আসা হয়েছিল !....সেই সর্বোত্তমা ! পরমেশ্বরের সেই উত্তমা ! কী প্রাণচঞ্চল খুশিতে ঝলমল মেয়েটা। যখন তখন দু লাইন গান গেয়ে ওঠা, কথায় কথায় দু'লাইন কবিতা 'কোট্' করা। আর সব কথার মধ্যেই কৌতুকের রস ঝরানো।

বিয়ের আগে কর্মদিন তো ঘোরেনি দুজনে, একসঙ্গে—এবং অন্য বন্ধুদের সঙ্গে।....বেশ ক'জন বন্ধু তো পরমেশ্বরকে ঈর্ষাই করতো। অবশ্য খোলাখুলিই প্রকাশ করতো সে কথা, বলতো, ওই ভ্যাবলা 'পরমটা' তোকে লটকালো কী করে সর্বোত্তমা ?

সর্বোত্তমা হেসে গড়িয়ে বলতো, কে কাকে লটকেছে ?

তা তুই বা কেন ? লট্‌কাবার মতো আর কাউকে পেলি না ?

হি হি হি। সেই যে কী একটা বলে, 'কী বা হাড়ি কী বা ডোম।' ধরে নে তাই।

আমাদের কিন্তু তোর সম্পর্কে অন্য ধারণা ছিল। তুই যে শেষ পর্যন্ত ওই মাকাল ফলটাকে মন দিয়ে বসবি –

পরমেশ্বর রাগ দেখিয়ে বলেছে, এই তোরা কিন্তু মাত্রা ছাড়াচ্ছিস।....

আর সর্বোত্তমা হেসে হেসে বলেছে, 'মন'টা দিয়ে বসেছি, একথা আবার তোদের কে বলতে গেল ? দিয়েছি তো 'কথা'। ভেবে দেখলাম এভাবে আর বেশিদিন শুধু ঘুরলে আমার বাবা বেচারীর ওপর একটু অন্যায় করা হবে। বেচারী সেকেলে মানসিকতার লোক, তাঁর বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়জনদের পরিমণ্ডলও তাই। আর বেশি চাপ দেওয়া ঠিক নয়। তাই বাবাকে কথাটা দিয়ে ফেললাম। তাতে 'মন' দেওয়া কথাটা উঠছে কেন ? ওটা কী নিজের কণ্ট্রোলে ? ইচ্ছেমতো দিয়ে ফেলা যায় ? হুঁ। জানিস না—

'মন নিয়ে কেউ বাঁচে না রে,
মন বলে যা পায় রে—
কোনো জন্মেই 'মন' সেটা নয়
জানে না কেউ হায়রে !
ওটা কেবল কথার কথা,
মন কী কেহ চিনিস ?
আছে কারো নিজের হাতে
'মন' বলে এক জিনিস ?
চলেন তিনি নিজের তালে
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে—
কেই বা তাঁরে দিচ্ছে,
এবং কেই বা তাঁরে নিচ্ছে !'

পড়েছিস তো সবাই। বুঝেছিস কেউ ?....

চোখেমুখে হাসি ঠিকরে বলেছে, আমার তো ধারণা 'মন' জিনিসটা অনেকটা একটা চাবিবন্ধ আয়রনসেফ-এর মতো। তবে চাবিটা তার মালিকের হাতেও থাকে না। সে নিজেও জানে না, কী আছে সেই বন্ধ আলমারির মধ্যে।

কৌতুকের ছলে বলা নিজস্ব ধারণার কথা।

অথচ সেই মেয়ে বাস্তব জগতের একটা চাবিবন্ধ সিন্দুককে খুলে দেখবার জন্যে জীবনমরণ পণ করছে। এর থেকে হাস্যকর আর অদ্ভুত কী আছে ? কই পরমেশ্বরের তো অত কৌতূহল নেই। ধরে নিয়েছে কী আর থাকবে ? হয়তো সেকালের ছিটেফোঁটা জমিদারীর—ছিটে-ফোঁটা নিদর্শন কিছু খাতাপত্র দলিলটলিল। জমিদারী প্রথা লোপের

পর যার সমস্ত মূল্য শেষ হয়ে গেছে। এমন নিরুত্তাপ কৌতূহলই তো সকলেরই।

অথচ সর্বোত্তমা ?

ওই তো। যেন ওটা ওর জীবনমরণের ব্যাপার।

আচ্ছা। ও কি মনে মনে ধারণা করেছে, সেকালের কিপটে বুড়োর সঞ্চয়ের ঘরে অনেক লুকনো সম্পদ রয়েছে? টাকাকড়ি সোনাটোনা। কিন্তু তাতেই বা হিসেব মেলে কই? ওসব মোটা দাগের মধ্যে তো ফেলা যাচ্ছে না ওকে। ও নিজের সব কিছুই তো দিয়ে দিতে চায়।

তাহলে কী সত্যি 'ভূতে পাওয়া' শব্দটাকেই মানতে হবে? মানতে হবে সেই আর এক আগুনের ঝলক মেয়েটার কথা।.... কেন মানবো না? আমি বাবা পূর্বজন্ম পরজন্ম ভূত ভগবান সবই মানি।'

ঘরে ফিরে আবার সেই মেয়েটাই চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। এও তো কম জ্বালা নয়। আমি কী বদলে যাচ্ছি? আমি কী বিশ্বস্ততা হারাচ্ছি ?

ধ্যাৎ তাই বা ভাবতে যাচ্ছি কেন? কাউকে একবার একটু ভালো লাগলেই, বিশ্বস্ততা হারানো হলো? ওটা একটা বাজে সেকেলে মতবাদ।....তবু এই চিন্তার সংঘর্ষের মধ্যেই যেন একটু নিশ্চিন্ততার শান্তি।....যাক বাবা, 'সাঁকো প্রসঙ্গে' কী সমাচার পেশ করে গেছে সে সেটা সর্বোত্তমার মনে নেই।...

কিন্তু কেন বারবার এ বাড়িতে আসে ও ?

'কেন আসে' সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই আবার এসে হাজির সুবর্ণা নামের মেয়েটাই। তবে এখন এলো—মস্ত একটা কারণ নিয়েই।

স্বাভাবিকভাবে সেই সুরেলা শানানো গলায় ডাক দিয়ে উঠলো, ও জ্যাঠামশাই। এই আপনাদের সিন্দুক ভাঙবার মিস্ত্রী। আপনারা খোঁজ করে বেড়াচ্ছেন খবর পেয়ে বাবা পাঠিয়ে দিল। এর কাছে সবরকম যন্ত্র-পাতি আছে। বলেছে পুরনো কাঠের সিন্দুক? ফুঃ।....ও নাকি ব্যাঙ্কের লকার ভাঙবারও ক্ষমতা রাখে।

লালকমল তাড়াতাড়ি উঠোনে নেমে এসে হেসে ফেলে বলেন, সিন্দুক 'ভাঙবার' মিস্ত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছি এ খবর তোমার বাবাকে কে সাপ্লাই করলো? শুধু তো 'খোলবার' কথাই হয়েছে।

চাবি বানানো হয়েছে ?

না না। একটু জংধরা ব্যাপার, খোলবার চেষ্টা করতে হবে। এই যে এসো বাপু এদিকে। তোমার বাবা একে পেলেন কোথায় ?

পেলেন কোথায় ? বাবা খলিফা লোক। কত রকম কারবারির সঙ্গে জানাশোনা।

তারপর ?

'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে—'

গ্রাম না হোক পাড়া।

'ঘোষালদের পোড়ো বাড়িটার সেই চাবিহারানো বন্ধ সিন্দুকটা নাকি খোলা গেছে। স্ক্রু খুলিয়ে—লোক ডাকিয়ে। ভূতের সিন্দুক।'

অনেকেই জানে। কারণ সিন্দুকটা এখানে একটা কিংবদন্তীর মতো। সিন্দুকটার মধ্যে ভূত আছে। রাতে বেরিয়ে আসে। ছাতে ঘুরে বেড়ায়। ..

যখন খোলা হবে বেরিয়ে পড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে না তো ?

হাসির চাষের সঙ্গেই এই আলোচনা। তবু কৌতূহলের শেষ নেই। এসেছেন মোহনও, বলতে গেলে সপরিবারে। অবশ্য পরিবারটি বাদে। তিনি সহজে সে সব জায়গায় উপস্থিত হন না, যেখানে তাঁর ওই ধিঙ্গী অবতার বেহেড বড় মেয়েটি থাকে। অথচ সেটিই এখন আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। তিনি বলেছিলেন, 'ছুতোরমিস্তিরীর সঙ্গে ঝর্ণা বুলা ভোম্বল যে কেউ তো যেতে পারে। ওর যাবার কী দরকার ? বাড়িটা চিনিয়ে দেওয়া নিয়ে তো কথা।' তো ধিঙ্গী অবতার নিজেই লাফিয়ে উঠলেন, আরে যাবো না ? ওটা তো একটা দ্রষ্টব্য। 'হুশ করে' ভূত বেরোয় কিনা দেখতে হবে না ? হ্যাঁ বাবা। ওই রটনা করেই তো তুমি চোর ডাকাতদের ঠকিয়ে এসেছো ? তাই না ? তবে যা সরাবার তা কী আর আগেই না সরিয়েছ ?

বাবা দাঁতে দাঁত পিষে বলেছিল, এই হারামজাদীর জন্যেই আমায় একদিন দেশত্যাগী হতে হবে।

তবু এসেছে। সঙ্গে বালখিল্য বাহিনী।

হ্যাঁ, সেই জংধরা স্ক্রু খোলা গিয়েছিল।

সর্বোত্তমার কথা তাহলে মিথ্যে নয়। 'ভূষণ্ডিবুড়ি বলে, ওঁর কথা অবিশ্বাস অবজ্ঞা করছেন বাবা। সত্যিও তো হতে পারে?'

তা সত্যিই তো হলো। একটি একটি করে সেই সাতটি গুলি খুলে ফেলার পর চাড় দিতেই উঠে পড়েছিল সেই বন্ধ ডালা।

কিন্তু কী ছিল তাতে? খোলামাত্রই চমকে দেবার মতো। শিউরে দেবার মতো।

নাঃ। 'আসল' জিনিস কিছুই নেই।

থাকবেই বা কোথা থেকে? বড় ঘোষাল বাড়ির কর্তা বলেছিলেন, কী আর থাকবে? শেষ বয়েস পর্যন্ত তো আর কর্তা রোজগার করে চলতে পারেননি। জমিদারি আইনের ফলে অনেক জমিই তো বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল সরকার, সেদিকে আয় কমে গিয়েছিল। ছেলেটাকে তো মানুষ করে তুলতে হয়েছে। বে-থাও দিয়েছেন। সে ছেলে অকালে গেলে তার বৌ-ছেলেকেও দেখতে হয়েছে। জমা টাকা আর কতদিন থাকে। অথবা সোনাদানা?

যা ছিল তা হচ্ছে কিছু পোকায়-কাটা মামুলি কাগজপত্র জাব্দা খাতা। একখানা উইয়ে-খাওয়া লালচেলি, একটা পোকায় কাটা ছোট্ট গামছার পুঁটুলিতে চারটি কড়ি আর হলুদ নাকি। একখানা চৌকো ফ্রেমে বাঁধানো জীর্ণ মূর্তি রং জ্বলা হলদেটে হয়ে যাওয়া ঝাপসা একটা ফটো। খুব নিরীক্ষণে মনে হয় কোনো একটা বিয়ের কনের ফটো। সাজের ধরনে তাই মালুম। তবে মুখটাই বেশি ঝাপসা হয়ে গেছে। আর—হ্যাঁ এই সঙ্গে ছিল একটা অভাবনীয় বস্তু। খুলেই লোকে শিউরে চমকে গিয়েছিল। তারপর হতভম্ব।

প্রথমটা মনে হয়েছিল বৃহৎ একটা কালো চামর বুঝি। কালো চামরও থাকে বৈকি। শনিপুজোয়টুজোয় কালো চামর লাগে।

হুমড়ে দেখা গেল, চামর নয়, বৃহৎ এক ঢাল চুল।

কাটা চুল।

তার একটা দিক কালো সুতো দিয়ে মুঠিয়ে বাঁধা।

রুক্ষ ধূসর বিবর্ণ সেই চুলের ঢালটাই তাহলে বড় সিন্দুকটার সম্পত্তি। এর জন্যেই ত্রিভুনেশ্বর ঘোষাল সিন্দুকটায় সাত চাবির কৌশল করেছিল।

দূর! দূর! এই দেখবার জন্যে লোকের ছুটে আসা। এতকাল

'রহস্য' ভাবা।

তার মানে বুড়োর প্রাণে অনুতাপ জেগেছিল।

হেসে গড়িয়ে পড়ে সুবর্ণা।...ফুলে ফেঁপে ভেসে ওঠার পর লাশের চুলকাটা কাদা খোঁচা মাথাটা দেখে বুকটা হাহাকার করে উঠেছিল বোধ হয়। আহা বুকে করে তুলে রাখা হয়েছে কনের চেলি গাঁটছড়ার কড়ি হলুদ। আবার ফটো। . রাতে বার করে নিয়ে বুকে করে শুতো না তো? আহা 'দ্বিতীয় পক্ষ' বলে কথা। হি হি হি। একেই বলে জ্ঞান-পাপী। ওমা। বৌদি অমন কাঠপুতুলের মতন বসে থাকতে থাকতে গড়িয়ে শুয়ে পড়লেন কেন গো?....ও জ্যাঠামশাই। আসুন তো। বৌদি। ও বৌদি।

সাপ খেলানেওয়ালা তার সাপটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরে নিয়ে বিদায় নিতে না নিতেই যেমন জমায়েত জনতা উধাও হয়ে যাওয়ায় জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যায়, তেমনি ফাঁকা হয়ে গিয়েছে ঘোষালদের পোড়োভিটের দালান উঠোন ভেতর ঘর। বহুদিন যাবৎই যেখানে এত জনের পদপাত ঘটেনি।..

তবে আর কোনোদিন ঘটবেও না। এরপর ওর ভাঙা পাঁজরের খাঁজে খাঁজে গাঁইতি শাবলের ঘা পড়বে। ওর হাড়গোড়গুলোকে জড়ো করে লরীতে চাপিয়ে নিয়ে চলে যাবে সুরকি কলে, সুরকি বানাতে। যেমন যায়, গিয়ে চলেছে—যত সব পুরনো পুরনো প্রাসাদ অট্টালিকা, বড়ো বড়ো বাড়িরা। তাদের দেওয়ালে দেওয়ালে সেঁটে থাকা আর ইঁটের গাঁথুনির খাঁজে খাঁজে জমে থাকা বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকতার ইতি-হাসের অনুক্ত কাহিনীর সঙ্গে কত হাসি অশ্রু বঞ্চনা হাহাকারের পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ভেসে হারিয়ে যায়।

পুরনো বাড়িরা আর মাটি আগলে পড়ে থাকবে না। পড়ে থাকবে না পোড়োবাড়ি, চামচিকের বাসা ভরা দালান, ঠাকুর দালান, পতিত জমি, জঙ্গুলে বাগান।...নতুনদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হচ্ছে তাদের খোয়া হতে, সুরকি হতে, ডোবা পুকুর ভরাট করতে।

ওই গাঁইতি শাবলদের শব্দরা জানিয়ে চলবে, একটা কাল শেষ হয়ে গেল। এবার অন্য কাল। নতুন কাল। তাই নতুন ইমারত।

কিন্তু সেই সব নতুন ইমারতের দেওয়ালে দেওয়ালে কী আর কোনো দিন জমে উঠবে না অত্যাচারের হুংকার আর অত্যাচারিতের হাহাকার।

কে জানে কী হবে। তবে নবীনগঞ্জের ত্রিভুবনেশ্বর ঘোষালের পোড়োভিটেয় আর কোনোদিন কোনো অশরীরীর গুমরে গুমরে চাপা কান্নার আওয়াজ শোনা যাবে না। সেখানে তৈরি হবে একটা 'অ্যাজবেসটাস' সীট তৈরির কারখানা। প্ল্যান ছক আগে থেকেই মজুৎ ছিল। শুধু এই ভিটবাড়িটার দখল পেতে টালবাহানায় আটকে ছিল এতদিন। কবে থেকেই তো জাল পেতেছিল 'ছোটো ভটচায'।

যাক শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে লোকটা।

কিন্তু সর্বোত্তমা নামের সেই মেয়েটা, যে এখানে এসে হঠাৎ নিজেকে হারিয়ে ফেলে, একটা ছায়াছায়া জগতের মধ্যে চলে যেতে বসেছিল। তাকে কী চিরতরে হারিয়ে ফেলে এখানের মাটিতেই রেখে যেতে হলো, ফিরে যেতে হলো, হৃতসর্বস্ব দুটো মানুষকে হাহাকার নিয়ে?

নিঃসন্তান রঞ্জাবতী ঘোষালের অপমানাহত রুষ্ট ক্ষুব্ধ আত্মা কী ত্রিভুবনেশ্বরের ওপর প্রতিহিংসায় প্রতিশোধ নিয়ে বসেছিল, তার পরবর্তী প্রজন্মের এক নিরপরাধ বংশধরের ওপর?

নাঃ। তেমনি দুর্ঘটনা ঘটেনি।

শুধু ওদের ফিরে যেতে আরো দুটো দিন দেরি হয়ে গিয়েছিল। সর্বোত্তমাকে কায়িক মানসিক খানিকটা সুস্থ করে তুলতে।

যাবার নামে সর্বোত্তমা অবাক হয়ে বলেছিল, আমি কী করে যাবো বাবা। এখানে সব ফেলে রেখে?

কী 'সব' এর কথা বলছো বৌমা? এখানে যা সব আনা হয়েছে, সবই তো গুছিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

ওর জন্যে নয়। এখানে যা সব ছিল আমার? ফেলে চলে যাবো? আমার একটা দায়িত্ব নেই?

তখন আসরে নেমেছিল সেই মুখরা প্রখরা মেয়েটা। জোর দিয়ে বলেছিল, আপনার আবার এখানে কী ছিল শুনি?

আমার কিছু ছিল না?

মেয়েটা আবার জোর দিয়ে বলেছিল, কী আবার থাকবে?

তার মানে পরমেশ্বরের কথাই বোধহয় ঠিক। অসুস্থ আত্ম-বিস্মৃতির দাওয়াই হচ্ছে ধমক। মেয়েটাও এ থিয়োরিতে বিশ্বাসী। তাই জোর দিয়ে বলেছিল, কী আবার থাকবে? নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দেখুন তো আপনি কে? আপনি হচ্ছেন লালকমল ঘোষালের পুত্রবধূ। পরমেশ্বর ঘোষালের গিন্নী, সর্বোত্তমা ঘোষাল। না কী নয়?

বাঃ। তাই তো।

তবে? আপনি কিসের দায়িত্বে এখানে পড়ে থাকতে চান? আপনার শ্বশুরমশায়ের বাঘা ঠাকুর্দা ত্রিভুবনেশ্বর ঘোষালের দ্বিতীয় পক্ষ রঞ্জাবতী ঘোষালের ছেঁড়া চুলগুলো আগলাতে? যাঁর প্রেতাত্মা তাঁর সেই সাড়ে তিন হাত লম্বা চুলগুলোর শোকে তিনকাল ধরে হাহাকার করে মরছেন, বাড়ির সর্বত্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আর গুমরে গুমরে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন? মাথাখারাপ না কি আপনার? মহিলা তো রাগে অপমানে নিজেকে ওই দীঘির জলে ডুবিয়ে মেরেছিলেন, তো তাঁর সেই ফেলে যাওয়া চুলগুলোকে সেইখানেই সদগতি করে দেওয়া যাবে। দীঘিটা এখনো আছে আধমরা হয়ে। নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলবো, যা স্বর্গে চলে যা।

সেই দীঘিটা এখনো আছে? অ্যাঁ।

তা থাকবে না কেন? ভূষণ্ডিবুড়ির কালের ব্যাপার না? বুড়ি এখনো জলজ্যান্ত বেঁচে চালভাজা গুঁড়িয়ে খাচ্ছে না? ঝাঁকান ঝাঁকান। নিজেকে ঝাঁকান।

তারপর একটু হেসে বলেছিল, শুধু এই পোড়োবাড়িটায় নয়, আমাদের সকলের মধ্যেই হয়তো একটা চাবিবন্ধ সিন্দুক থাকে, তাকে খুলে দেখবার চেষ্টা না করাই ভালো। আপ্রাণ চেষ্টায় খুলে দেখলে— হয়তো শেষমেষ দেখা যাবে, তার মধ্যে চারটি ছেঁড়াচুল আর পোকায় কাটা কাগজের কুচি।

....

আবার সারিসারি খান তিনেক সাইকেল রিকশা এসে দাঁড়িয়েছে ঘোষাল বাড়ির ভাঙা দেউড়ির বাইরে। সামনেটায় লালকমল, মাঝখানে তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ. পিছনে রমার মা গৃহস্থালীর সাজসরঞ্জাম সমেত।

লালকমল তাঁর নিজেরটায় উঠে পড়ে, মোহন ভটচায্যির বেহেড

মেয়েটার মাথায় হাত দিয়ে আস্তে বলেন, তোমার মতো এমন একটা মেয়ে আমি আর কখনো দেখিনি মা। আমার যদি আর একটা ছেলে থাকতো, তোমায় আমার ঘরে নিয়ে যেতাম।

এই আবেগ গাঢ় কথার পিঠে কি না মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, সর্বনা-শ। হাড় জ্বালাতে আর ঘর জ্বলাতে?

নাঃ। ঘরে সারাক্ষণের জন্যে রোশনাই জ্বালাতে।

আর তখনো কিনা মেয়েটা ওঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলে ওঠে, নাঃ জ্যাঠামশাই। আপনার ছেলে হলেই তো ওই একখানা ল্যাতপেতে ননীর পুতুল হতো? সে আমার পোষাতো না। হ্যাঁ জুটলে আপনার ঠাকুর্দার মতো একখানা বাঘা, তো দেখা যেতো। আচ্ছা . টা টা।

অন্য রিকশায় লালকমলের ছেলে তার বৌয়ের একখানা হাত আবেগ ভরে চেপে ধরে বলে, যা অবস্থা করে তুলেছিলে, তোমায় যে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো, এ ভরসা ছিল না।

সর্বোত্তমা একটু হেসে বলে, যাকে নিয়ে এসেছিলে, তাকেই কী নিয়ে যেতে পারছো?

আঃ, উত্তমা! আবার ওরকম কথা কেন?

কী করবো বলো? একটা বন্ধ সিন্দুকের ভেতরেই যে দেখে মরেছি। যার মধ্যে শুধু চারটি ছেঁড়া চুল আর পোকায় কাটা কাগজের টুকরো।

তোমার কথার মর্ম বোঝা আমার কর্ম নয়।

ওই তো মুশকিল। প্রাথমিক সোপান তো ওই মর্মটাই বোঝা। যাক্‌গে। কী আর করা। এই ..এই ওই সামনের দিকে তাকিয়ে দেখো ওই গাছতলায়—

কী দেখবো?

সুবর্ণা দাঁড়িয়ে। আমাদের 'টা টা' করতে। ইস। কী জোরে ছুটে এসেছে।

পরমেশ্বর তাকিয়ে দেখে।

দুজনেই দেখে। কাঁধের আঁচলটা টেনে এনে সেটা দুলিয়ে দুলিয়ে ওড়াচ্ছে!

সর্বোত্তমা ব্যস্ত হয়ে বলে, এই রিকশাওয়ালা একটু থামাও।

কিন্তু সে কথা তার কানে পৌঁছবার আগেই অনেকখানি এগিয়ে এসেছে সে! থামাবার গা করে না!

সর্বোত্তমা আস্তে বলে থেমেই বা কী হবে? তবে তোমায় আর কী বলবো? আমিই তো মেয়েটার প্রেমে পড়ে মরে বসে আছি!

———